প্রথম সংস্করণ : আগস্ট ১৯৫৭

প্রচ্ছদ : সুনীল দাস

প্রকাশিকা : মনীষা ভট্টাচার্য
অন্বেষা, ৮৯এ, এন কে ঘোষাল রোড
কলকাতা ৭০০ ০৪২।

মুদ্রণ : পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস, ৭৫ পটলডাঙা স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : **দশ টাকা**

কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ

লেখকের অন্যান্য বই

দর্পণে অনেক মুখ

শবযাত্রা

হেমন্তের সনেট

আগুনের বাসিন্দা

ইবলিশের আত্মদর্শন

অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সংক্রান্ত

বিযুক্তির স্বেদরক্ত

শ্রেষ্ঠ কবিতা

বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন

ষাট দশকের শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রকাশিতব্য

দ্রোহহীন আমার দিনগুলি

সূচীপত্র

কানাই কবিতার বিরুদ্ধে

এক

আমার এক তরুণ বুদ্ধিবাদী বন্ধু বাংলা কবিতার সাধারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তার মার কাছে শোনা মাতৃভক্ত একটি ছেলের গল্প বলেছিলেন। কানাই নামক ষোলো বছরের তরুণ এতোটাই মাতৃপ্রাণ, খেলার সময়ে বন্ধুদের কিছু না জানিয়ে ছুটে বাড়ি চলে আসতো, মাকে জড়িয়ে মাতৃদুগ্ধ পান কোরে তক্ষুনি আবার মাঠে চলে যেতো। এটা ছিলো তার আশৈশব অভ্যেস। দুধ থাক বা না-থাক একবার স্তন্যপান চাই-ই, মার কাছে ভক্তি প্রমাণ করতেই হবে। আবার তার মা প্রতিবেশীদের কাছে পুত্রের তুলনাহীন মাতৃভক্তির দৃষ্টান্ত তুলে অন্য মায়ের মনে নিজ পুত্রের আচরণ সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক তুলে ধরে খুশি হতো নিশ্চয়ই।

সাবালকত্ব এহেন কানাই কোনদিন অর্জন করেছিলো কিনা তা আমাদের জানা নেই, তবে বাংলা কবিতায় কানাই-এর মাতৃভক্তি প্রচণ্ড আদর ও মর্যাদা পায়, আর তা ঐতিহ্যের অঙ্গীভূতও হয়ে গেছে।

আমাদের সাহিত্যের পাঠক নিশ্চয়ই জানেন, কানুছাড়া গীত রচনা একসময় অসম্ভব ছিলো। ললিতগীতিকলিতকল্লোলে—জয়দেবীয় উচ্ছ্বাস অন্তত কোথাও কোথাও রাধাকৃষ্ণকে মাটির মানুষের ক্রিয়াকর্মে অনুলিপ্ত রেখেছে, আর বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাগরাগিণী উল্লেখ কোরে গান হিসেবে পদ রচনা করলেও পৌরুষজড়িত মানুষীকথার অভাব রেখেছেন, তা মনে হয় না। বড়াই, রাধা আর কৃষ্ণের যে নাটকীয় কাহিনী ও সংলাপ তাঁর কাব্যে দেখেছি তাতে কানুকে নিয়ে মস্করা করতে ছাড়েন নি। অন্তত আদি-মধ্যযুগের এই কাব্যটি পড়ে প্রমাণ করা কঠিন, ধর্মপ্রাণ ভক্তের মনে অনুভব জাগ্রত করার ইচ্ছে থেকেই বড়ু চণ্ডীদাস লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

অতএব, যে সব উন্নাসিক প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বাংলা কবিতায় পৌরুষ নেই, শুধুই কেবল ছিঁচকাঁদুনে পালাকীর্তন, তারা শ্রুতিকথনে বিশ্বাসী ; যথেষ্ট

প্রীতি নিয়ে অনুশীলনে রত হননি কখনো। কেননা, বৈষ্ণব কবিতা আস্বাদ করতে গিয়ে যে সব কবির কবিতা শুনে চৈতন্যদেব অশ্রুসজল হতেন, তাঁদের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন না। চৈতন্যসংস্কৃতি আমাদের সমাজ জীবনে রেনেসা, মধ্যযুগের পক্ষে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণ', এই উচ্চারণ যে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিলো, 'শুনরে মানুষ ভাই / সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই'—তিনিও চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আর পদাবলীর কবি একই ব্যক্তি হয়তো নয়, কেননা একই কবির এতোটা বিপরীতধর্মী কবিতা হওয়া প্রায় অসম্ভব; অথচ এসব বিতর্কের কূটকচালিতে না গিয়ে কবিতার পাঠক হিসেবে মনে হয়, বড়ু চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের আগেই জনপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, আর দ্বিজ চণ্ডীদাস হয়তো সমকালীন। দ্বিজ চণ্ডীদাস চৈতন্যদেবের জীবন, তাঁর উদার আদর্শকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন জীবনাচরণে, কবিতায়। আমার এই মত ঐতিহাসিক বিচারে টেকানো কঠিন; তবে সব কিছুই যুক্তি তর্কে প্রতিষ্ঠা করা সময় সাপেক্ষ, অনেক কিছু অনুভবে জেনে নিতে হয়, অন্তত কবিতার পাঠককে।

সামাজিক সংস্কার কতোটা স্থায়ীভাবে করতে পেরেছিলেন চৈতন্যদেব বা তাঁর পার্ষদগণ তা গবেষণার বিষয়, কেননা তাঁদের অন্তর্ধানের পরে তাঁরা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত ও গৃহীত হবার পরেও হিন্দু সমাজের নৃশংস আচার বন্ধ হয়নি। সতী-দাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান দান, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি অমানুষিক অত্যাচারে নারীসমাজ মুমূর্ষু, বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের। কিন্তু, শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে, যেহেতু কথাসাহিত্যের তখনো জন্ম হয়নি বাংলায়, পদ্যই ছিলো সব ভাবনামূলক ও অনুভূতিনির্ভর ভাষাশিল্পের মাধ্যম, সুতরাং—কবিতা এবং যাত্রা ইত্যাদি চৈতন্যের ভাবপ্লাবনে ভেসে যেতে বসেছিলো তখন। এই সময়ের কিছু পরে ভারতচন্দ্র ভাবালুতা-সর্বস্ব কবিতার পরিবর্তে বুদ্ধি, মেধায় কেলাসিত আবেগ কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বৈষ্ণব কবিতাকে ভাবালুতা-সর্বস্ব বলা সামগ্রিক ভাবে ঠিক হবে না। জ্ঞান দাস বা গোবিন্দ দাসের বহু পদে বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চমৎকার আধুনিকতা দেখেছি। আর আমাদের কবিতায় সচেতন ভাবে **craft**-এর অভাব কখনো ছিলো না। স্টাইল সচেতন বলে শুধু ভারত-চন্দ্রকে চিহ্নিত করা একদেশদর্শিতা। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাসের বহু পদ অসামান্য শিল্পচেতনার পরিচয় বহন করছে।

তবু যেহেতু প্রেম নামক অনুভূতিকে দিব্য হতে হবে, তাই বৈষ্ণব কবিরা

সাহসী হয়ে উঠতে পারেন নি। মধ্যযুগের অবরুদ্ধ কামবৃত্তি মাঝে মাঝে ঝলসে উঠেছে। ব্যক্তিগত এই প্রবৃত্তিকে কি ভাবে ধর্মের ঐশীকম্বলের তলায় চেপে রাখা যায়, সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কবিরা সে ব্যাপারে অতিরিক্ত সচেতন হয়ে উঠেছেন। ফলত, তাঁদের কবিতা মানুষের জীবনের বহু তল স্পর্শ করতে পারে নি, সচেতন ভাবেই কঠোর সত্যকে এড়িয়ে যেতে হয়েছে; আর এই আচার-সচেতনা এক সময় শুচিবায়ু রোগের কারণ হয়ে বসলো, শুরু হলো 'কানাই কবিতা'র জয়যাত্রা। তার জন্ম বৈষ্ণবী আচারসচেতনায়। আর যতোই বয়স বেড়েছে, শুচিবাই সরিয়ে নিয়েছে উপভোগের উষ্ণসুন্দর জীবন বৈরাগ্য-কঠোর শুকনো জীবনের দিকে। এর ব্যতিক্রম মাঝে মাঝেই প্রচুর শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পাঠক সাধারণ তখন বৈষ্ণবকবিদের আফিঙে এমনই আসক্ত, সন্দেহ আর প্রতিরোধে আধুনিকতার এই নিঃশব্দ বিপ্লবকে উদাসীনতায় অগ্রাহ্য করেছে। অন্তত মন খুলে প্রশংসা করতে পারেনি। এ সত্য অস্বীকার করা অসম্ভব।

প্রাচীন আলংকারিকদের মধ্যে কবিতার শরীর ও আত্মা নিয়ে বিতর্ক চলেছে দীর্ঘকাল। শুধু শব্দসংস্থান আর বাক্য গঠনের সৌন্দর্যই কবিতা নয়, তা তাঁরা বুঝেছিলেন; এও জেনেছিলেন 'রমণীদেহের লাবণ্য যেমন অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য কিছু, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি, এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু,—এই অতিরিক্ত বস্তুকেই তাঁরা কাব্যের আত্মারূপে স্বীকার কোরে নিয়েছিলেন। অতুল গুপ্ত বিশ্লেষণ কোরে দেখিয়েছেন, বস্তুবাদী আলংকারিকগণ মনে করতেন, 'অন্য বাক্যের মতো কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে কোনো বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু বা সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের বস্তু ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন, ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে যা স্বভাবতই মনোহারী—চন্দ্র চন্দন কোকিলালাপভ্রমর ঝংকারাদয়ঃ। অনেক ভাব, যেমন—প্রেম, করুণা, বীর্য, মহত্ব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এই সব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন।

অর্থাৎ শুচিবাই কবিতাবিচারের মুক্ত মনকে সেকালে প্রভাবিত করেছিলো

অনেকখানি। যারা, আধুনিক জড়বাদীদের মতো রক্ত মাংস মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার সঞ্চার হয়, মনে করতেন; ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকার—এদের যথাযথ সমবায়েই কবিতার সৃষ্টি জেনেছিলেন, তারা এই সবের অতিরিক্ত বস্তু, যা না হলে প্রতিমার মতন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে কবিতা, থাকে পদ্যের স্তরে, তা কেন বুঝে উঠতে পারেন নি, বলা কঠিন।

আমাদের কবিতা পৌরুষনির্ভর, বুদ্ধি ও চৈতন্য, কল্পনা ও সত্য দৃষ্টিতে বহুতল বিস্তারী হয়ে উঠেছে অনেক পরে, বিশের দশকে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মোহিতলাল মজুমদারের কিছু কবিতায়, পরে ত্রিশের জীবনানন্দ বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথের মনীষা কল্পনা-প্রতিভার জলসেকে,—রবীন্দ্রনাথে নয়, তার আগে মধুসূদনের বীরাঙ্গনায় স্ফূর্তি পেয়েছিলো, তা এখন স্পষ্ট। আঁতকে উঠবার মতন কথা বটে, কিন্তু বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয় স্টান্ট দিয়ে বাজিমাৎ করা; বরং এর পেছনে ব্যক্তিগত উপলব্ধি, ধারাবাহিক ঐতিহ্য অনুশীলনের যা ফল-শ্রুতিমাত্র—তা-ই কাজ করেছে, অত্যন্ত বিনীত ভাবে জানিয়ে রাখতে চাই। বাঁধাঘাটের চরণদার না হলেই বিপথগামী বলে ঢেরা পিটিয়ে দেওয়া যায় প্রচার-যন্ত্রের আনুকূল্যে, কিন্তু বহু অনুশীলনে যে বোধে একজন ব্যক্তি পৌঁছোতে পেরেছে, তাকে উড়িয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

রবীন্দ্রনাথে এসে পোষাক পেয়েছে মুখোশের সম্মান, কেননা আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেছেন তিনি; যে পৌরুষ বারবার রাজনৈতিক কারণে গর্জে উঠেছে তাঁর, তা-ই নারীসুলভ নমনীয়তায় ভেঙে পড়েছে কবিতায়। ঐ যে সুদূর অতীতে বস্তুবাদী আলংকারিকদের কেউ কেউ ঘোষণা করেছিলেন, কাব্যের বিষয় হবে মহৎ, চমৎকার, অভিনব,—কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করবে বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর, সব বস্তু বা সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়—তা তিনি ধ্রুব বলে জেনেছিলেন, মেনে ছিলেন, ফলত প্রতিভার অজস্রতায় উজ্জ্বল এই কবি আপন অন্তর্গত তাড়নায় আধুনিকতাকে স্বীকার কোরে নিতে পারেন নি, শেষ জীবনে বাধ্য হয়ে বিদেশী কবিতার দ্বারা পুষ্ট হয়ে কবিতার সাজ পোষাকের বদল ঘটিয়েছিলেন মাত্র। ফলত তা অনেকটাই কৃত্রিম আর অগভীর। এ দুটো দোষ রবীন্দ্রনাথের স্বভাবে আগে ছিলো না। বরং উল্টোটাই। তিনি যা লিখতেন, তেমনি ভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন; কোথাও অস্পষ্ট কল্পনা ছিলো না। শেষ বয়সে এসে তাঁর স্থৈর্য নষ্ট হতে বসেছিলো। জোব্বা দিয়ে সব ক্ষত ঢেকে রাখা দীর্ঘদিন চলে না, এই অনুভূতি তাকে চঞ্চল কোরে দিয়েছিলো,

বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন 'বলাকা' থেকে নতুন পরিক্রমায় ; এই পরিক্রমণের টান যতোটা বুদ্ধিগ্রাহ্য, ততোটা তাড়নাজাত ছিলো না, তা প্রমাণিত সত্য।

দুই

জীবনানন্দের কবিতায় সিরিনিটির অভাব দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ প্রসঙ্গে যে চিঠি রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দকে লিখেছিলেন, প্রত্যুত্তরে জীবনানন্দ লিখেছিলেন—

"পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্ন মনে আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা 'সিরিনিটি' জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুব অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরণেব সুর আছে, সে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের ডিভাইন কমেডির ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর সিবিনিটি বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন বকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানারকম 'মুড্‌স্' খেলা কবে। সে 'মুড'গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের চোখের ভালবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরেব আগুন দেখে, সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। 'মুড'-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে 'সিরিনিটি' অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারি না।"

এই চিঠিটা নানা কারণেই মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভাবনার সঙ্গে আধুনিক কবির পার্থক্য কতো বড়ো তা বোঝা গেলো, আবার জীবনানন্দের কবিতা-বিশ্বের সূত্র নির্দেশকও এই চিঠি। মনে হয়, যে মানসিকতার পার্থক্য

দুই কবির পত্রচালনায় স্পষ্ট হলো, রাবীন্দ্রিক আর অরাবীন্দ্রিক কবিতার বিপরীত পথে চলারও সূক্ষ্ম কারণ খুঁজে পেলাম এখানে। এই চিঠির শেষের দিকে জীবনানন্দ বলেছেন—

"শান্তি বা সিরিনিটির সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।

বীঠোফেনের কোনো কোনো সিমফনির বা সোনাটা-র ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে,—কিন্তু আজো তা টিকে আছে—চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।"

যে সিরিনিটির অভাব রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করে, তা বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিক কবি মধুসূদনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। মধুসূদন অস্থির, কম সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের অর্থসংকটের সুরাহা কি ভাবে সম্ভব তা নিয়ে ভাবিত; আবার কবিতা, নাটক, মহাকাব্যের নতুন ফর্ম ও কনটেণ্ট প্রচলনের দায়িত্বে চঞ্চল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বৈষ্ণবীয় প্রশান্তি আয়ত্ত করতে একবারই চেষ্টা করেছিলেন তিনি। বীরাঙ্গনা বা চতুর্দশপদী কবিতার ছত্রে ছত্রে অস্থিরতা, অশান্তি। মধুসূদন জীবনযাপনকেই কবিতা করেছেন, আর কি হতে চান তার জন্য অস্থির উৎসাহ; রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসংস্কারের বাইরে যেতে পেরেছেন কখনো সখনো, তাও দায়ে পড়ে, অর্থাৎ স্বভাব তা মেনে নেয়নি।

বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে; গৃহকর্ম্মভুলি পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির মধু-মাখা!
(সোমের প্রতি তারা/বীরাঙ্গনা কাব্য)

প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি,—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমিষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ,) সেবিব তোমারে!

* * *

……নাম সূর্পণখা।

কত যে বয়স তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ ; নরমণি.!
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইব তখনি !
আইস ভ্রমর-রূপে ; না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে ! কি আর কহিব ?

(লক্ষণের প্রতি সুর্পণখা/বীরাঙ্গনা কাব্য)

কোনো কাব্য সংস্কার না মেনে মধুসূদন গুরুপত্নীর শিষ্যকে প্রণয় নিবেদন, বাল্য-বিধবার প্রেমজ দুঃখ অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করলেন। মানলেন না সিরিনিটির গণ্ডী ; প্রচলিত সমাজ যা গ্রহণ করতে পারে না তাকে মর্যাদা দিলেন কবিতায়। ব্যক্তিজীবনকে সনাতনী সংস্কারের বাইরে এনে বরণ করলেন যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, বিষাদকে , প্রোথিত করলেন তার এসেন্স কবিতার আত্মায় ; আর উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ সাকার উপাসনার বাইরে লালিত পালিত হয়েও গ্রস্ত হলেন ব্রাহ্ম শুচিবাইয়ের দ্বারা ; প্রায় আজীবনই নিষ্ঠ ছিলেন তাতে। একবার 'চতুরঙ্গ'-এ মানুষের জৈব জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করলেন, আর ছিঁটেফোটা ছোটগল্পে। শেষ বয়সে এসে আবেগনির্ভর অসহ্য কাল্পনিক ন্যাকা প্রেম নিয়ে দুগ্ধপোষ্য বাঙালী পাঠকদের মুগ্ধ করতে চাইলেন শেষের কবিতায়। কবি যে মোহান্ত নন, সে সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণায় লুটোপুটি খেতে খেতে ভয়ংকর ও শান্ত উপলব্ধিকে কবিতায় প্রোথিত করেন, জীবনানন্দের এই মুক্ত দৃষ্টি রবীন্দ্র-নাথের মধ্যে দেখি না, ফলত ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের বাঁধাসড়কে হাঁটতে দেখি তাকে, আর রোমান্টিকদের কল্পস্বর্গের দিকে মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে তাকান তিনি—

আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে
দৈবে হতেম দশমরত্ন নবরত্নের মালে

অশোককুঞ্জ উঠতো ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে
বকুল হ'ত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে
প্রিয় সখীর নামগুলি সব ছন্দ ভরি করিত রব
রেবার কুলে কলহংসকলধ্বনির মতো

আত্মা নিষ্কাসিত দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই—

দাও ফিরে সে অরণ্য লহ এ নগর

এই জগতের আমরা কেউই বাসিন্দা নই; রবীন্দ্রনাথও নন, তবে অতীতের দিকে ভাবাকুল স্বপ্নবাষ্প ছড়িয়ে হা হুতাশ করা রোমান্টিকতার ধর্ম; ওই জগতে আনন্দ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ, প্রেম, উৎসব; এই জগতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এ দৈব-বিড়ম্বনা; যতো তাড়াতাড়ি পরিত্রাণ পেয়ে ওই স্বর্গে যেতে পারি, তার জন্য আর্তনাদ—এ সব রোমান্টিকদের স্ব-নির্মিত শোক ও সান্ত্বনা; এইসব পুরোমাত্রায় রবীন্দ্রনাথের ছিলো। জীবনস্মৃতি নামক আত্মজীবনী লিখছেন তিনি, তাতে পোষাকী চেহারাটা ভাষার চমৎকার ব্যবহারে শ্রুতিসুখকর, অথচ সংসারের কাদামাখা রূপটার আটপৌরে দিক একদম বিস্মৃত হলেন, মনে হয় ইচ্ছে করেই; এখানেও নির্বাচন, শুচিবাই। যা কুশ্রী, অসুন্দর—তারপ্রকাশ সাহিত্যে চলবে না; সজনে ফুল সাহিত্যে অপাংক্তেয়, কেননা, ওটা খাদ্যবস্তু, প্রয়োজনের জিনিষ। গোলাপ নিয়েই পদ্য লিখতে হবে।

এইসব সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে চলতি জীবন, তার ব্যবহারিক রূপ কবিতায় কি ভাবে আনা চলে তার প্রয়াস দেখি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কিছু রিভিল, উন্মোচন করতে জানতেন না। কবিতা উপলব্ধির উন্মোচন, আত্মদর্শন, উন্মোচিত আত্মার কোলাহল। কিছুই অপাংক্তেয় নেই সেখানে, প্রতিটি অনুভূতিলব্ধ উপলব্ধিই গ্রাহ্য; সম্মানিত। গোলাপ আর সজনে ফুল, রজনীগন্ধা আর ঘেঁটু ফুল, নায়িকা আর পতঙ্গ, সবই প্রয়োজনের, যদি থাকে এর অন্তর্গত রহস্য ও তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষমতা; জানা থাকে প্রয়োগ কৌশল, সমন্বয়ের প্রতিভা, বীক্ষণের স্বীকারোক্তি।

খণ্ডিত দৃষ্টি মাত্রই শিল্পের স্বাভাবিকতার বিরোধী। জীবন যা জড়িয়ে থাকে, তা-ই কবিতার বিষয়, শিল্পের সামগ্রী, প্রজ্ঞারও পরাকাষ্ঠা। যতীন্দ্রনাথ এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই যা কিছু রবীন্দ্রবিশ্বে পরিত্যক্ত, তা তিনি কবিতার বিষয়ও কোরে গিয়েছেন নির্দ্বিধায়; তবে, বিষয়বস্তুর বর্ণনায় তিনি দক্ষ যেমন, তেমনি অনুভব নিষ্কাষণে প্রায় ক্ষেত্রেই অসার্থক।

বার বার তিন বার,—
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার!
শোন রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা

ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।

দেশোদ্ধার/যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

উচ্চারণে দ্বিধা নেই। স্পষ্টবক্তা কবি। নেই অনুভবসিদ্ধউপলব্ধি। আছে ঘোষণা, যা কেলাসনে উজ্জ্বল না হলে কোনো দ্বিমাত্রিকতাও পায় না। অথচ কখনো কোথাও কবিতায়স্পৃষ্ট পংক্তি দেখি যতীন্দ্রনাথে

বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধ'রে রঙিন বারাঙ্গনা।

জ্ঞানের সত্য আর অনুভূতির সত্য, এসব নিয়ে হতে পারে কবিতা, যদি তা প্রজ্ঞাশাসিত হয়, হয়ে ওঠে কল্পনাপ্রতিভার আলিঙ্গনে, অনুভবের সজলতায় অর্থঘন, ব্যঞ্জনাঘন।

বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক উর্বরতার সূত্রপাত তিরিশের ক্ষমতাবান কবিদের সময় থেকে। পদ্য আর কবিতার সূক্ষ্ম আর স্থূল যে তফাৎ তা এঁরা জেনেছিলেন বিশ্বপথিক হবার পরেই। রবিয়ানাকে ধ্রুব মনে কোরে আত্মবিসর্জনে কালিদাস কুমুদরঞ্জন যতীন্দ্রমোহনের উৎসাহে এঁদের সন্দেহ করা স্বাভাবিক ছিলো। সময়ও বদলাচ্ছে ঘটনার ঘাতে প্রতিঘাতে। বিশ্বযুদ্ধ, ফ্রয়েড ইয়ুং পাবলভ, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ক্রমপ্রসার ও রাষ্ট্রপরিকল্পনায় নতুন ভাবনা, ইয়ুরোপের জীবনযাত্রায় নানামুখিন টেনসান, বাংলা কবিতাতেও সঞ্চারিত হয়েছিলো তিরিশের কবিদের পঠন পাঠনে আসক্তি, আন্তর্জাতিক কবিতাচর্চা, মননে আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। চলমান জীবন, প্রতিদিনের রক্তমোক্ষণ সমদূরত্বে ভাসতে থাকেনি কবিতার সঙ্গে; সমান্তরালরেখায় জীবন ও শিল্প চলছিলো যা এযাবৎ, তারই নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হওয়া, এরই নাম আধুনিকতা। কবিতার পক্ষে, যে কোনো শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী, একটি শর্ত। মধুসূদনে এরকম দেখেছি। ব্যক্তিগত আশা, আশাভঙ্গ, অপরাধবোধ, অসম্পূর্ণতার জন্য যন্ত্রণা কখনো লিরিকে কখনো ছদ্মবেশী মহাকাব্যে, নাটকে—আমরা দেখেছি। ফলত, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত আবেগশাসিত স্পন্দন আজও অনুভব করি আমরা। রবীন্দ্রনাথে এসে শিল্প এবং জীবন সমান্তরাল দূরত্বে স্থাপিত হলো। সৌন্দর্য হলো শর্ত ; সত্য পড়লো ছদ্মবেশী রাজবেশ। কবিতা এক সাজানো, বসবার ঘরের আলমারিতে রাখার মতন চীনে পুতুল; ব্যসনে, রাজদ্বারে, শ্মশানের সর্বক্ষণের সঙ্গী হতে পারলো না ; সঙ্গীতে তিনি যেমন করতে পেরেছিলেন।

স্বভাব কবির বিশ্ব

আমাদের বৈদগ্ধ যেখানে নিন্দায় সোচ্চার হতে দেখেছি সংগত কারণে, সেই স্বভাবকবিত্ব ইদানিং বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের শ্রুতিসিদ্ধ শিল্পকলায় পুনরায় প্রশংসিত হতে শুরু করেছে। ইদানিংকার পাঠক, অন্তত একাংশ হয়তো মনেই করেন, স্বভাবের মধ্যে কবিত্ব যার অফুরন্ত, স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ যদি ঘটে তার তবেই কবিত্বের পরকাষ্ঠা ; তাই স্বভাব কবি ব'লে গোবিন্দ দাসকে যতই নিন্দা করি না কেন প্রকাশ্যে, রচনাকর্মে অপ্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে যান ওই বহু নিন্দিত গোবিন্দ দাসই। স্বভাব কবিদের রচনার অন্তরালে সব সময় থাকে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, যা প্রায় ক্ষেত্রেই সোচ্চারও বটে। আবেগের মোক্ষণ ঘটে সরলরেখায়। আবেগের প্রশমন এদের স্বভাবে গ্রাহ্য নয়। হয়তো এমত চিন্তা এর অন্তরালে সক্রিয়—আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ রুদ্ধ হলে কৃত্রিমতা এসে পড়ে ; অতএব সচেতন স্তরে বসে নির্মাণের প্রকল্প গ্রাহ্য হতে পারে না ; নির্মিতির পেছনে থাকে বুদ্ধির শাসন, বোধের অতলান্তিক মাত্রাচেতনা যা আবেগের কণ্ঠরোধ কোরে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে ; অতএব কবিতার প্রজন্মের পক্ষে প্রকল্প পরিত্যাজ্য, স্বভাবের স্ফূর্ত স্রোতে ভেসে যাওয়াই চরম সিদ্ধির শর্ত।

আবেগবাহিত চতুর্দোলায় বরবেশী কবির স্বপ্নপ্রয়াণ কতটা দুর্দৈব ঘটাতে পারে, রবীন্দ্রনাথের কাহিনী কবিতাগুলি তার সাক্ষ্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ জাতীয় কবিতা শেষপর্যন্ত কোনো বুদ্ধির শৃংখলামণ্ডিত বোধে পৌছে দেয় নি আমাদের। অবশ্য রোমান্টিক কবির স্বভাবেই থাকে বন্যতা, অবাধ আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, যাকে ক্লাসিক শাসনে বাঁধা প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। রোমান্টিক দৃষ্টি ও ক্লাসিক সংহতির মিশ্রণে যে চমৎকার শিল্পসাফল্য ঘটে যায়, বোদলেয়রের কবিতা তার সফলতম দৃষ্টান্ত হয়ে আছে ; আর বায়রনিক বিশ্ব-বীক্ষা, শেলীয় বিপ্লবপণা যে বন্য আবেগেরই ইতরবিশেষ, আমাদের এ শিক্ষা ইতিমধ্যেই অর্জিত হওয়া উচিত ছিল। তরুণ কীটস অন্তত এই স্বভাবকে

শাসনে বেঁধে দেওয়া ছাড়া শিল্পের গত্যন্তর নেই একথা বুঝে নিয়েছিলেন প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবেই। তাই তাঁর রচনাকর্মে অন্তত বর্জন করা চলে এমন একটি মাত্র পংক্তিও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

রোমান্টিকতাকে গয়টে কেন অসুস্থতা বলে চিহ্নিত করেন তখনি তার অন্তর্গত ইঙ্গিত ধরা পড়ে যখন বুঝতে পারি এ এমন একটা ব্যাধি যা চৈতন্যের শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী নয়, প্রকাশের ব্যাকুলতায় আত্মবিস্মরণ ঘটে পদে পদে; বিষয় রূপে এমন সবকিছু নির্বাচিত হয় যার অন্য নিরপেক্ষ অবস্থান থাকে না। ব্যক্তির তাবৎ আবেগ সংলিপ্ত থেকে শৃংখলা ভাঙে বার বার।

স্বভাব কবিরা স্বভাবতই রোমান্টিক চরিত্রের মানুষ। অনুভূতিকে উপলব্ধির স্তরে নিয়ে যেতে স্বভাবতই তাদের অনীহা প্রকাশ পায়। দায় শুধু স্বীয় ভাবের অবাধ প্রকাশে; ভাবনার সংহতিতে বেঁধে দেওয়ার স্থৈয তাদের স্বভাবে কুলোয় না। শ্রোতা এখানে গ্রাহ্য নয়; বিহারীলালের আত্মতন্ময়তা, রবীন্দ্রনাথ যাকে প্রকৃত কবির চরিত্ররূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তা স্বভাব কবির প্রকৃষ্ট চরিত্রায়ণ।

আমাদের উনিশ শতকী ধ্রুপদী পুনর্জাগরণে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রেব পদস্খলন এই অপরিস্রুত আবেগের সংহতি সাধনের অক্ষমতায়। এই কবিদের উচ্চাশা বিচরণক্ষেত্রের পরিমাপ; যা সাধ্যে কুলায়, তা অগ্রাহ্য কোরে স্বভাবের বিরোধিতায় নেমেছিলো; যেহেতু পঠন-পাঠনজাত অভিজ্ঞতার অপ্রতুলতা ছিল না, তাই অপরিসীম আত্মপ্রত্যয় জন্মেছিলো স্বাভাবিকভাবে; অথচ লিরিক চরিত্র যে শিল্পীর পক্ষে দূষণীয় নয় তা না বুঝে সেই অলভ্য ফলের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো যা পূর্ববর্তী অসামান্য প্রতিভা দ্বারা চর্চিত হয়েও সম্পূর্ণ অধিকারে আসেনি, তাকে সহজলভ্য ভেবে পরিণামে অপরিসীম অক্ষমতার নিদর্শন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। মধুসূদনের চরিত্রে ক্লাসিক স্বভাব জন্মার্জিত, আর তাঁর পঠন-পাঠনের তালিকায় লিরিকের তুলনায় ধ্রুপদীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করে, তিনি তাঁর অধিকার সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন, যদিও আমাদের কাছে এ সত্যও অপ্রমাণিত নয় যে মধুসূদনের লিরিকের প্রতিও ছিল সমান পক্ষপাত, অন্তত তাঁর স্বভাবে তার অসদ্ভাব ছিল না। তাই ব্যক্তিত্বের বন্ধনহীন মুক্তি যে লিরিকের অন্যতম চরিত্র, তিনিও বাংলা সাহিত্যে প্রথম কবিতায় তা সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। কবি যদি আবেগের হাতে আত্মসমর্পণ কোরে বসেন, তাহলে কতটা দুর্দৈব ঘটাতে পারে, বিহারীলালের সারদা মঙ্গল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়ে আছে। মৌল কোনো ভূমির নির্ভর না

থাকায়, বুদ্ধির যুক্তি না থাক, আবেগেরও যে যুক্তি এক্ষেত্রে অপরিহার্য তা মান্য হয়নি, ফলত দৃশ্যের পর দৃশ্য কথার পর কথা যে বাণের তোড়ে ভেসে বেড়াচ্ছে এখানে, যা থেকে বিশ্ববিধানের এতাবৎ অপরিজ্ঞাত কোনো উপলব্ধি সত্যের দ্যুতিতে জ্বলে উঠতে পারেনি। বিহারীলালের এই স্বভাবের বাধাবন্ধ-হারা চরিত্র কবিতার স্ফটিক-স্বচ্ছ উপলব্ধির যে অন্তরায় তা শিষ্যপ্রতিম রবীন্দ্রনাথও দীর্ঘকাল বুঝে উঠতে পারেননি। ভাবতে অবাক লাগে, বীরাঙ্গনার পত্রগুচ্ছ এর আগে রচিত হয়ে গেছে, যেখানে শৈলী ও অনুভূতির চমৎকার প্রকাশ প্রমাণ করেছে বাংলা ভাষার অপরিসীম সম্ভাবনার কথা। মধুসূদন ব্যক্তিক নৈরাশ্য-জনিত আবেগ মোক্ষণের সময়ও শৈলীর সচেতন কারুকর্ম বিষয়ে মনোযোগের ভূমিকার কথা ভোলেননি। যে লিরিকটিতে তাঁর যৌবন-জাগৃতির নিষ্ফল কান্না শুনেছি আমরা, তাতেও আবেগের হাতে ছেড়ে দিয়ে, সতর্ক প্রয়োগকলার প্রতি বিন্দুমাত্র অমনোযোগ দেখাননি। আর বীরাঙ্গনায়? নায়িকাদের আশা-নৈরাশ্যের মনস্তত্ত্ব-সম্মত কাব্যিক বিশ্লেষণের অন্তস্থলে কবি-ব্যক্তিত্বের সহানুভূতি আরোপিত, বুঝতে অসুবিধে হয় না। কখনো শৃংখলার শৈথিল্য ক্ষমার্হ নয় তাঁর কাছে, অর্থাৎ আপ্লুত নন বিষয়ের আন্তরিকতায়, সর্বক্ষণ সচেতন এবং সচেষ্ট; মানসিক বা শারীরিক বিষয়ের বিকলতা নেই; বিহারীলালের যা হামেশাই চোখে পড়ে; বিরক্তি জাগায়, বিমর্ষ কোরে তোলে। বিহারীলালের রচনা পাঠকালে এমন কখনো মনে হয় না যে কবিতা রচনার পেছনে প্রেরণা ছাড়া, ইমোশানের পারগেশান ছাড়া পরিশ্রম ও প্রবৃত্তির অবদমনের কোনো ভূমিকা আছে। যেন, প্রকৃতি বা প্রেম বা গার্হস্থ্য কোনো সম্পর্ক কিংবা আধ্যাত্মিকতার নিবিড় উপলব্ধি ব্যক্তি মনের দর্পণে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, কাব্যিক ভাষায় তার মোক্ষণ হলেই কবিতার মান রক্ষা হলো। কবিতা লেখাটা যেন খুবই সহজ ব্যাপার; সহজ এবং জরুরীও বটে; অতএব পঠন-পাঠনের স্থৈর্য, অভিজ্ঞতার কেলাসন ও জীবন সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছ দৃষ্টি অর্জন, এ সবের জন্য অপেক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই। স্বভাবকবির মনোজগৎ অগভীর দিঘির মতন সামান্য বাতাসে তার আপাদমস্তক আন্দোলিত হতে থাকে, তাই সবক্ষণই অস্থির, উদ্বেল, উন্মাদ; যে-কোনো ঘটনা, সম্পর্ক, পরিস্থিতি তার রচনার প্রেরণার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ রচনা করে; বিষয়ের বেশ খানিকটা দূরত্বে উপবেশনের দ্বারা যে নির্লিপ্ত আত্মপ্রকাশ ঘটানো সম্ভব, যে স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি অর্জন হতে পারে, স্বভাব কবির জগতে এমত চিন্তার কোনো

প্রবেশাধিকার নেই। ভাবতে কষ্ট হয়, এই কবিত্বপণা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কবিতা রচনাকালে বর্জিত হতে দেখি না, যদিও মধ্যজীবন থেকে তাঁর মোহমুক্তি ঘটতে দেরী হয়নি।

এক সময়, বিজ্ঞান-বুদ্ধির অভাববশতই মনে করার রীতি ছিল, কবির ক্ষমতা ঈশ্বরীয় আশীর্বাদ মাত্র, জাগতিক বিধি বিধান তার সম্পর্কে অন্তত খাটে না; এই বিশ্বাসই হয়তো অলৌকিক কিংবদন্তীর সৃষ্টি করতো এমনভাবে যাতে পার্থিবতার দায় যে ব্যাক্তি মানুষটি কোনোদিন বহন করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া ছিল দুরূহ। আজ আমরা 'কবির জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ' এমত আপ্তবাক্যে আস্থা হারিয়েছি, যদিও প্রেরণা শব্দটির সঙ্গে যে দৈবতা জড়িত তা জেনেও ওর প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হারাতে পারিনি। কবিওয়ালাদের কথা মনে করুন; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাদের এতই যে আসরে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, আর উপস্থিত শ্রোতাদের বিস্মিত করার অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, এদেব মতন স্মার্ট, উপস্থিত বুদ্ধি-সম্পন্ন, সজাগ কবিত্ব একালের ধুরন্ধররাও দেখাতে পারবেন না। যে কথাটা বলতে চাই, কবিওয়ালামাত্রই স্বভাব কবি, এদের দায় উপস্থিত শ্রোতাদের শ্রুতির সুখ ঘটানো; আর প্রাপ্তিযোগও হাতে হাতে; খুশী তারা শ্রোতাদের আন্দোলনে; পোবাকের উজ্জ্বল পটে বিজয়ীর চিহ্ন সেপ্‌টিপিনে এঁটে আবার বন্যতাসৃষ্টির চটুল বেসাতিতে নেমে পড়েন। সময় নেই আঙ্গিকের ভিন্নতা সৃষ্টির, উপলব্ধির প্রকাশকল্পে শব্দ বা অনুষঙ্গবাহী শব্দ বা অনুষঙ্গবাহী শব্দগুচ্ছ নির্বাচনের; অভিজ্ঞতার মন্থন, বৈচিত্র্য বা বিপ্লব ঘটানো, কোনো দিকে তাকানোর মতন বিন্দুমাত্র সময় বা শ্রমদানের সময় নেই হাতে। উপস্থিত জনতা কি চায়, কতো সহজে তাদের মুগ্ধ হাততালি কুড়ানো সম্ভব, অস্থির স্থৈর্যহীন কবিগানের কবি জেনে নিয়ে নিজের প্রেরণাকে পরিচালিত করেন সেই দিকে; অর্থাৎ স্বভাবের হাতে স্বভাবিকভাবে ছেড়ে দেন নিজেকে। বুদ্ধির রাশ টেনে স্বভাবেব বন্য ঘোড়াকে বশ মানাতে পারেন না। কবিওয়ালাদের এই বন্য চরিত্র স্বভাবকবির চরিত্ররীতির পরিপূরক, অর্থাৎ বৈপরীত্যে আসীন তো নয়ই।

(ক) হরি কে বুঝে, তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে।
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে॥

(খ) যদি শ্যাম না এলো বিপিনে,
তবে কি হবে স্বজনি। . .
লম্পট স্বভাব তার জানি।
ওগো বৃন্দে এই সন্দ হয়,
সে গোবিন্দ যে আমারো বাধ্য নয়।
বুঝি কারো সহবাসে পোহায় রজনী।

কবি সংগীত থেকে দুটি ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত হলো এ কারণে যে এদের রচনায় যে বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না তা দেখানো, অন্তত একথা স্বীকৃত হবেই—শিল্প কৌশল, যা সচেতন স্তরের মনোযোগী ক্রিয়ার ফল, এখানে তা অবহেলিত হয়েছে—তাও দেখানো। সম্ভবও ছিল না এদের পক্ষে এমন কিছু করা যা অনুশীলিত হতে হতে পরিশীলিত হতে পারে, সূক্ষ্ম উপলব্ধি-ধারণযোগ্য একটা ভাষা আয়ত্ত করার মতন ধৈর্য ও সংযম অর্জন করতে পারে; অবশ্য, এদের সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত হতো তাৎক্ষণিক রেস্পনস পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। মোটামুটি কবিওয়ালাদের এই সহজ আবেগ প্রকাশের মানসিকতা নির্মাণ শিল্পের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা করে; বলা যায়, এমত রচনা পদ্যেরই ইতরবিশেষ। সমীক্ষা ও অনুশীলনের যোগফলে যে স্বভাব পায় স্বাভাবিকতা, এক্ষেত্রে তার অলভ্যতা স্বাভাবিক। আমরা অন্তত বুঝতে শিখেছি—রম্যতা আর কবিতা পাঠের আভ্যন্তরীন শর্ত অন্তত হতে পারে না; কবিতা এখন জীবনানন্দের ভাষায় '...এক ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।'

অসামান্য এই কবি, উপলব্ধি করেছিলেন রাবীন্দ্রিক শুদ্ধ কল্পনা বা সুধীন্দ্রিয় বুদ্ধির রস এক ধরণের কবিতা হয় বটে, তবে একালের কবি আর কল্পনার বিশুদ্ধতা রক্ষায় আগ্রহী নন, কেন না ঘটে গেছে ইতিমধ্যে দু'দুটো বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধ। মানবীয় অভিজ্ঞতার মানচিত্র এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে অখণ্ড সৌন্দর্য চিন্তা, নীতিনির্ভর আচরণকলা এখন অচেনা বিশ্বের রূপকথায় পরিণত! বরং মানুষ আজ অনেক বেশী প্রাজ্ঞ, চিন্তাপ্রবণ, সংশয়ী, ব্যাখ্যাতা; আবার দ্রষ্টাও বটে। তার ব্যাপ্ত খণ্ডিত বহুধা বিচূর্ণ অভিজ্ঞতাকে শিল্পে স্থান ছেড়ে না দিলে সমবয়স্ক পাঠকের অভিজ্ঞতার জগতে অপাংক্তেয় থেকে যাবে তা; অতএব অনিবার্য হয়ে উঠবে না সমঅভিজ্ঞ মানুষের দৈনন্দিনের, তাহলে এমত মণ্ডনকলা কিংবা বিলাসকলা কুতূহলী রচনার প্রয়োজন কি। এখন, এতাবৎ

মানবীয় মনীষাসৃষ্ট সম্পদে চরিত্রবান উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিসই কবিতা বলে সম্মানিত হবার উপযুক্ত; কবিকে এই উচ্চতর ভূমিকায় স্থাপিত করার গৌরব অর্জন করতে হবে একালের কবিকেই।

স্বভাব কবির গ্রামীণ সারল্য লোকাচারের পক্ষে প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কবিতার চরিত্র গঠনের পক্ষে তা অবশ্য পরিত্যাজ্য; এখানে স্বভাবে ও আচরণে নাগরিক সচেতনতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার আত্যন্তিক উপস্থিতি প্রয়োজন। মনে প্রাণে কবিকে নাগরিক হতে হবে; মার্জিত ও উচ্চকিত, বিনয়ী ও অহংকারী, অর্জিত শিক্ষায় পরিশীলিত, আচরণে সমন্বয়ী। অন্তত গ্রামীণ সারল্যের বিরুদ্ধাচারী এই গুণাবলী যদি কবিতার অন্তশ্চরিত্রে ও বহির্গঠনে বিশিষ্ট চরিত্র সৃষ্টিতে ভূমিকা না গ্রহণ করে, তবে বলতেই হবে লোক-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রচনার জন্য তিনি অনেকটাই মূল্য দিতে প্রস্তুত। আধুনিক জটিল মনন-সংঘর্ষের রক্তপাত তার ধাতে কুলোয় না, মনে-প্রাণে তিনি আদিম সারল্যেরই পক্ষপাতি, অথবা সেই গ্রাম্যচারণদেরই আত্মীয় মেনে স্বস্তি পান গোপনে যারা লোকজীবন থেকে আহৃত সরল সম্বন্ধ-সূত্র গাথাকারে রচনা কোরে হাটে বাজারে, পথের পাশে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতেন, কখনো সুর যোজনায় আকর্ষণ করতেন চলমান পথচারীদের। অথচ প্রকাশ্যে তারা এমন মুখোশ পরেন যেন এদের, এই গ্রাম্যচারণদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাও খুব দোষণীয়। এমত স্বভাবী কবিদের রচনায় স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব থাকবে না। প্রকৃতির মতনই তা হবে সহজ ও স্বচ্ছ, একমাত্রিক ব্যঞ্জনাহীন। রহস্যকুটিল চিন্তাভারগ্রস্ত ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার ভারে পতনশীল আত্মার মতন এই কবিতা ভারাক্রান্ত করবে না, করা তার উদ্দেশ্যে নয় এবং ক্ষমতা তার আয়ত্তে নেই বলেই।

বাংলা কবিতা স্বভাব কবিত্ব ত্যাগ করতে উন্মুখ হয়েছিলো ভারতচন্দ্র থেকে, অন্তত ভারতচন্দ্র কল্পনা ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন আবেগের সংহতি সাধনের। শব্দ মাত্রই যে বিষয়ের বাহন নয়, তার সঙ্গে দূরাগত সংস্কৃতি, লোকাচারের নানা অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে, তার সার্বিক সামর্থ নিষ্কাষণের প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করতেও পেরেছিলেন, যদিও একমাত্রিক অর্থের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার সময় তখনো আসেনি। তখনো গ্রামীণ সারল্যের মাত্রাবোধ পদে পদে লোকরুচির দিকে তাকে টেনে নিয়ে গেছে। তখনো কাহিনীর আশ্রয়চ্যুত শিল্পকলার উদ্ভব ঘটেনি। তাই মাত্রা সংযোজন

তাঁর মতন শব্দ সচেতন, শৈলী সচেতন কবির পক্ষেও সম্ভব হয় নি : অথচ বুঝতে পেরেছিলেন ভাবুকতার দিন অবসিত। দর্শনের আশ্রয় থেকে কবিতাকে উঠে আসতে হবে, হতে হবে নিজেই একটি দর্শন, খণ্ড খণ্ড দৃষ্টি। এই স্বচ্ছ বোধে পৌছেও কেন তিনি সফল হলেন না তার জন্য তৎকালীন পরিবেশকেই দায়ী করা চলে। এগোলেন মধুসূদন এই বৈদগ্ধের ধারাকে সূত্র হিসেবে গ্রহণ কোরে। আমরা প্রথম একজন স্বাভাবিক কবিকে পেলাম, যিনি প্রথম থেকেই সাবালক, স্বভাব কবিত্বের যে আপাতগ্রাহ্য জনসংযোগ ঈশ্বর গুপ্তের মতন প্রখরভাবে বুদ্ধিমান পদ্যকারকেও মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলো, মধুসূদন তাঁর হাতছানিতে আর সাড়া দিলেন না ; ছিঁড়ে ফেললেন লোকসংস্কৃতির সূত্রসম্বন্ধ বিশ্বপরিক্রমার প্রয়োজনে ; আমরা তাঁর হাত থেকেই আধুনিকতার অনেকগুলি সূত্র শিখে নিতে পারলাম।

বাংলা কবিতার ছিদ্রান্বেষী পাঠক একটু অনুসন্ধানেই খুঁজে পাবেন চৈতন্য আশ্রয়ী কবিতার পাশাপাশি নেহাৎ-কবিত্বের সচল ধারা চলে আসছে সেই উনিশ শতকের শুরু থেকেই। অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের, কবিওয়ালাদের মানসপুত্রদের প্রকাশ্য রাস্তায় চলাফেরা কখনোই থেমে যায় নি। মধুসূদন এক্ষেত্রে নিরুপায় দর্শক। কবিতা যে স্বভাবকথন নয়, যে কোনো সূত্রে উদ্দীপিত হলেই যেন তেন প্রকারে ছন্দ মিলের প্রচলিত নৈপুণ্যে তাকে বেঁধে দেবার সাফল্যই কবিতা নয়, মধুসূদনের আত্মনিবেদন নির্মিতির সপক্ষে দেখেও এঁদের শিক্ষা হয় নি তাতে। আমাদের কবিতা হয়তো পৌরুষে নির্ভর হতে পারতো, বিহারীলালের ভাবুকতাকে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকৃতি না দিলে। ওই জোয়ারে তাবৎ শৃংখলা ভেসে গেছে বোঝা যায় মধুসূদনের উত্তরসূরী প্রকৃত অর্থে না থাকায়। আর রবীন্দ্রনাথ এসে অর্ধশতাব্দীর উপর যে নমনীয়তার কুলপ্লাবী বন্যা বইয়ে দিলেন, তাতে—আত্মরক্ষা করার মতন তৃণগুচ্ছেরও দেখা মেলেনি। রবীন্দ্রনাথ স্বভাব কবির কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়টুকু শিখে নিলেন অতিরিক্ত শ্রদ্ধার মূল্যে, বর্জন করলেন তাবৎ ভাবুকতা, গ্রাম্য সারল্য। আনলেন রহস্য, উপলব্ধি, সংস্কৃতির সারাৎসার কবিতায় ; তাঁর হাতে কবিতা নম্র হলো, হলো বহু বিস্তারী, অতলান্ত ; হারালো পৌরুষ, দার্ঢ্য রূঢ় অভিজ্ঞতার স্বীকারোক্তি জীবনের বস্তুভার কঠিন উপস্থাপনের প্রয়োজন। তথাপি, তিনি দুহাত ভরে উজাড় কোরে দিলেন কল্পনার ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য, সূক্ষ্ম উপলব্ধির নিখিল সারাৎসার। কল্পনাশক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ও পরিণতি দেখলাম তাঁর মধ্যে ; এ ধারায় শেষ তলানিটুকুও

নিঃশেষ করলেন তিনি। সমকালীন অনুজরা পেলেন ভুক্তাবশিষ্ট; তাতেই তাঁরা কৃতার্থ; লেগে গেলেন পুনরাবর্তনে, চর্বিতচর্বনে। এই অনুজকুলের প্রত্যেকেরই চরিত্রে ছিল স্বভাব কবিত্বের তাবৎ বিশিষ্টতা; কেন, তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র-অনুজ কবিদের অপমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর বিশ্লেষণ এ তাবৎ প্রশ্নের সম্মুখিন হয় নি। এঁরা যে খুব কাছে ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের সূর্যপ্রতিম দীপ্তি এঁদের গ্রাস করেছিল তা নয়, এঁরাই সজ্ঞানে সশ্রদ্ধভাবে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন; বুঝতে পারেন নি বা চেষ্টাও করেন নি অগ্রজের এতো বড়ো সিদ্ধির কারণ কি, এবং সিদ্ধি অর্জনের জন্য তাঁর অধ্যাবসায়, পঠন পাঠন কি পরিমাণে করতে হয়েছিলো; বিহারীলালের হাত থেকে পথের ইংগিতটুকু জেনে নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অজানিত পথকে কতটা মূল্য দিয়ে বহুবিস্তারী কোরে তুলতে হয়েছিলো। তাঁরা এসব জানার আগেই, মূল্যমান নির্ধারণের আগেই, গুরুদেবের কাছ থেকে চলনসই পদ্য লেখার সামান্য শিক্ষাটুকু গ্রহণ করেই কবিতা লেখায় হাত দিয়েছিলেন, আর মনে প্রাণে যেহেতু নাগরিক স্বভাবের বিরুদ্ধবাদী, স্বভাবে গ্রামীণ সারল্য, তাই বিশ্ব-বিস্তারী সদা উৎসুক একালের পাঠকের রুচির দিকে পেছন ফিরিয়ে কড়ি ও কোমল, মানসী ও সোনার তরীর যুগের কিছু কিছু অর্জিত শিক্ষা নিয়ে কবিতা লেখা মক্স করতে শুরু করলেন; যা লিখছেন তাই কবিতা—এরকম যে ভুল বোঝার অবকাশ মহান পূর্বসূরী তাঁর প্রথম পর্বের রচনাতে রেখেছিলেন এঁদের পাঠ সেখান থেকেই নেওয়া শুরু হলো; তলিয়ে দেখলেন না, প্রেম বা প্রকৃতি মানুষ বা ঈশ্বরের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ যে বহুমাত্রিকতা আরোপ করেছেন তার আয়তন ও তলের পরিমাপ কতোখানি। তাই কুমুদরঞ্জন বা কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বা করুণানিধান স্বভাবকবির সহজাত পদ্য রচনার মোহকর আনন্দে মগ্ন হয়ে রইলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট অধিতবিদ্যা ও কবিক্ষমতা নিয়ে এগিয়ে এলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা মোহিতলাল। এই পর্বেই আর একজন স্বভাবকবির বন্য দুর্দান্তপনার সাক্ষাৎ পাচ্ছি আমরা, তিনি হলেন নজরুল ইসলাম। শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষা বা গৃহিণীপনার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী, দুর্দম প্রাণের আবেগে উদ্দাম একটি মানুষ, কথায় কথায় কবিতা বা গান তিনি অবহেলে রচনা করতে পারেন, ভাবতে হয় না কোন শব্দের পরে কোন শব্দ বসালে আরো বেশী লক্ষ্যভেদী হয় কবিতা, হয় ব্যঞ্জনাশক্তিকে অমোঘ; নিবিড় পঠনের অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিগত জানার পরিধিকে সুদে আসলে

যে বাড়িয়ে দেয়—এ বোধও ছিল না তাঁর বিন্দুমাত্র। যে কবিতাটি 'বিদ্রোহী' এমত একটি কবিতা নিয়ে তিনি যে আসর মাতালেন, ভাবলে অবাক লাগে, এমন সেন্টিমেণ্টাল রাবিস রচনা রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পরও লেখা কি কোরে সম্ভব হলো, নন্দিতও হলো তা; যে রচনাটিতে বন্য আবেগ আর বেহিসেবি শব্দ বমন ছাড়া কিছুই নেই বলা চলে, তা মাতিয়ে তুলেছিলো মাইকেল, রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী শিক্ষিত পাঠকদের পর্যন্ত; এর থেকে আশ্চর্য ঘটনা আর কি হতে পারে? স্বভাব কবিদের চরিত্রই হলো মাত্রাতিরিক্ত আবেগের শিকার হওয়া। এদের রচনা পাঠে মনে হয়, কবিতা হলো সুখপ্রদ বর্ণনাত্মক এবং সর্বজনগ্রাহ্য রচনা যা প্রস্তুতি ছাড়াই পাঠকের বিস্ময়কে নাড়া দেবে। কবিতা পাঠের জন্য বিশেষ কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই; পাঠমাত্রই ছন্দের স্পন্দনে, শব্দের অর্থ দ্যোতনায় আস্বাদনীয় রম্যতা সৃষ্টি হবে; হবে খুবই সরল, ছন্দসিদ্ধ ও সমিল; অর্থাৎ সংস্কৃত আলংকারিক যে সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর সন্ধান করেছেন, বিবেচ্য নয় তাও। এই সব যুক্তি এদের কাছে অন্ধ সংস্কারের মতনই মান্য ছিল বলে স্বভাব কবিতার স্তর থেকে অন্তত একটি কবিতাকেও এঁরা স্বাভাবিক কবিতার স্তরে উত্তীর্ণ করতে পারেন নি; স্বজ্ঞানে শিক্ষা দীক্ষা, বহু দেশ বিস্তৃত অভিজ্ঞতার স্বীকরণ শিল্পের পক্ষে অনাবশ্যক ভার জেনে, লঘু পদ্য রচনায় স্ব স্ব শক্তি নিয়োগ কোরে তৃপ্তির সন্ধান করেছেন।

মোহিতলাল কিংবা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই কবিতাকে আবেগের মাত্‌লামি থেকে বুদ্ধির বন্ধনে বেঁধে দিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং এই দায়িত্ব যাঁদের অপরিসীম শক্তিমত্তার দ্বারা সুস্থির ভাবে পালিত হয়েছিলো, সেই জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন বাংলা কবিতার আধুনিকতার পুরোধাও বটে; বস্তুত এঁদের হাতেই বিশ্ব সংস্কৃতির তাবৎ অভিজ্ঞান কবিতার পক্ষে জরুরী—এমন ঘোষণা বেজে উঠেছিলো। বদলে গেলো ভাষা ব্যবহারের রীতি; আবিষ্কৃত হলো শব্দের অনুষঙ্গবাহী বস্তুভিত্তিক ইংগিতধর্ম; প্রেরণা অস্বীকৃত না হলেও পরিশ্রমকে প্রতিভার প্রধান পালক বলে ঘোষণাও হলো এঁদেরই হাতে। সব দিক থেকে স্বভাব কবির সহজ সারল্য বর্জিত হলো; এলো জটিলতা ও রহস্য; বস্তুভার ও নির্বিকারত্ব; সন্ধান ও সংশক্তি; পৌরুষ ও রম্যতার মেলবন্ধন ঘটলো ত্রিশের কবিতার সাধারণ চরিত্রের উপাদান হিসেবেই; নিন্দা করা হলো স্বভাবের দাসত্বকে; আবেগের ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের কর্তব্যকে অবশ্যপাল্য বলে জানানো হলো স্বীকৃতি। তৃপ্তির

পরিবর্তে সন্ধান, স্থৈর্যের বদলে আকুলতা; নিয়ত প্রশ্ন-মনস্কতা কবিতাকে সাধারণ ভোগ্য রম্যতার হাত থেকে উত্তীর্ণ করলো বিশ্ব-সংস্কৃতির সাম্প্রতিক জটিল, প্রাজ্ঞ, ব্যক্তিত্ববাহী, অভিজ্ঞতাবিদ্ধ, দেশকাল পরিচয়দীর্ণ বিস্তীর্ণ ভূগোলে, আমরা স্বভাব কবির হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যক্তিত্ব অর্জনের মন্ত্র জেনে নিলাম।

আমরা রবীন্দ্রনাথের আগে যে কজন কবির মধ্যে সচেতন নির্মিতির শিল্পী-স্বভাব লক্ষ্য করেছি, ভারতচন্দ্র এবং মধুসূদন—অন্তত গঠনাত্মক দিক থেকে যে শিক্ষনীয়তার সন্ধান তাঁরা দিয়েছেন, গ্রহণ করিনি তাঁদের পরামর্শ; ভেবেছি, প্রতিভা মাত্রই স্বয়ম্ভু, দৈব অনুকম্পা; জন্মালব্ধ; বুঝিনি—পূর্বপুরুষ প্রদত্ত সম্পত্তি সুদে আসলে বৃদ্ধি না ঘটালে মূলধন ভাঙিয়ে দীর্ঘদিন চলে না; এ সত্য কতো গভীরভাবে বুঝেছিলেন, বিহারীলালের স্বভাব কবিত্ব থেকে সামান্য ইংগিতমাত্র ঋণ হিসেবে গ্রহণ কোরে রবীন্দ্রনাথ তাকে কিভাবে অস্বীকার পর্যন্ত করেছিলেন! আমরা দেখি, অর্ধশতাব্দী ধরে ফর্মের পরীক্ষা থেকে সরে দাঁড়াতে তাঁকে একবারও দেখি নি, আর বাংলা ভাষার তাবৎ অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার সীমান্ত অনুসন্ধানে তিনি অক্লান্ত। এসব চরিত্র স্বভাব কবির স্বভাব বিরোধী। তাই ভারতচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্র-বিষ্ণু দে-সুভাষ-সমর সেন—প্রভৃতি কবিদের চর্চা অনুচর্চার ইতিহাস জানা সত্বেও, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বলতে শুনি, পদ্য লেখা ছাড়া কবির কোনো কাজ নেই; পড়াশুনা পদ্যের স্বতস্ফূর্ততার পক্ষে ক্ষতিকারক। এ সিদ্ধান্ত স্বভাব কবিরই সিদ্ধান্ত, লেখেনও সেইভাবে। বহুচর্চিত ছন্দের একটু অদলবদল ঘটিয়ে কিছু চলতি-অপ্রচলিত শব্দ ছন্দে বেঁধে খেয়াল খুশীতে সংখ্যাহীন পদ্যের জন্ম দিয়ে বাহবা কুড়ান; চিন্তা, প্রকল্প, সন্ধান, অভিজ্ঞতার মন্থিত নির্যাস, পঠন পাঠনের মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞানময় শৈলী আত্মীকরণ, স্বভাবকে সংহত করণের নানা মুখীন প্রযত্ন এরা সজ্ঞানে এড়িয়ে চলেন। এ যেমন একদিক, সাম্প্রতিকতার অন্যদিকে আছে সাংবাদিকতার গন্ধরূপ। অবশ্য এই ধারানুগামীগণ সচেতনাকে অস্বীকার করেন না, তবে ঈশ্বর গুপ্ত যেনো নতুনভাবে কথা বলেন, বোঝা কঠিন নয়; চাতুর্য, অগভীরতা, উৎক্ষেপ, অন্ধতা এদের রচনাকে পাঠ্য পদ্যের স্তরেই আবদ্ধ রাখে, যদিও শ্রুতিজনিত রম্যতার অভাব নেই। ফিচার, উপন্যাস-গল্প আর কবিতার মধ্যে যে সামান্যতম ভেদরেখা বর্তমান অন্তত এদের বহুনন্দিত পদ্যবস্তু তা প্রমাণ করে না; স্বভাব কবিত্ব এ সময়ের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি; হয়তো কারণ

আছে স্বাভাবিক কবিতার সাম্প্রতিক রুদ্ধগতির। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বিপুল প্রত্যাশার অপমৃত্যু, সাম্যবাদী আন্দোলনের বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা, মূল্যসূচির অপ্রতিরোধ্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, গণনাহীন যুবকের নৈরাশ্য; সর্বোপরি নতুন মূল্যবোধের অভাব; এইসব এবং আরো নানাবিধ ব্যাধি শিল্পকলার সৃষ্টি-প্রেরণার পশ্চাতের প্রয়োজনীয় ধৈর্যের চ্যুতি ঘটিয়েছে। ক্রমশ হিন্দী চটুল ফিল্‌মি গান ধ্রুপদী রাগ সংগীত, রবীন্দ্রসংগীতের স্থান জুড়ে বসেছে; ফলত সংস্কৃতিগত বিপর্যয়েরই প্রভাব এক শ্রেণীর চটুল অতিস্মার্ট পদ্য রচনায় উৎসাহিত করছে; পঠন-পাঠন-শ্রম ও সহিষ্ণু নির্মাণের অবলুপ্তি ঘটছে নিয়ত—আশংকা, হয়তো জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ-চর্চিত ঐতিহ্যের খুব অত্যল্প চর্চার পরেই অবলুপ্তি ঘটবে অচিরেই।

কবির কাজ

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।—জীবনানন্দ দাশ

'কবির কাজ জগৎকে বদলানো নয়, জগৎকে অনুভব করা'—ইংগিত দিচ্ছে তাবৎ শিল্পের মৌল চরিত্র কি হবে তারই; এবং যখন এই উপলব্ধি একজন কবির, বুঝতে অসুবিধে হয় না তিনি কবিতাকে কোন ভূমিকায় দেখেছেন, আর এই দেখার মধ্যে শিল্পপ্রেরণার অন্তর্নিহিত সত্যের চরিত্রটিও বাস্তব হয়ে উঠেছে—কি না।

কবির দ্বন্দ্ব তাঁর ভূমিকাটি সঠিক কিনা—তা নিয়ে। কেন লিখবেন, অর্থাৎ তাঁর লেখা নিজের কাছে অনিবার্য প্রকাশ চায় কিনা; না নেহাৎ শব্দচর্চার মজা পেতেই লেখেন তিনি, থেকে যায় এসব প্রশ্ন; সমাধান কোরে নিতে হবে তাকেই, কেন না প্রয়োজনটা ব্যক্তিগত হলে সমাধানের জন্য প্রতিবেশীর তেমন মাথাব্যথা থাকে না। একটা সংকটে তিনি গ্রস্ত—তাই বিষাদ। গ্রীক পুরানের সেই লেবিরিনথের সঙ্গে এর তুলনা চলে, যেখানে প্রবেশ করলে পথ হারাবেই, আর হারালেই পরিণামে দৈত্যের মুখোমুখি; অতএব কি ভাবে বেরিয়ে আসবেন তার জন্য সুতো ফেলে ফেলে যেতে হবে তাকেই।

কে দায় বহন করতে বলেছে তাকে, কি রকম সেই দায়িত্ব যা স্বেচ্ছায় বহন করা ছাড়া তাঁর নিষ্কৃতি নেই; এই স্বেচ্ছাগৃহীত দায় বহন কেন করবেন কবি, কি আনন্দ পাবেন তাতে—এই সব প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভবত তাঁর জানা নেই। তবে নিরুত্তর না থেকে হয়তো বলবেন, তিনি এই পৃথিবীতে এসে যে সব অভাবিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন,—তা জানিয়ে যেতে চান সমকালীন মানুষদের, কিংবা উত্তর পুরুষের জন্য কোরে যেতে চান সঞ্চিত; যাতে একটি অসংখ্যের অন্তর্ভুক্ত মানুষ ব্যাপ্ত পৃথিবীর নানা আঘাতে কিভাবে একক ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছেন, কি দেখেছেন দুচোখ অতৃপ্ত রেখে, কি জেনেছেন আর কতটা

অনুভব করেছেন—সেই সব অজানিত অভিজ্ঞতা সুন্দর আর সাংকেতিক কোরে রেখে গেলে উত্তরপুরুষ সেই সব রহস্য সম্পর্কে পূর্বাহ্লেই জেনে নিয়ে ভিন্নতর অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে পা বাড়াতে পারে। এ হলো প্রয়োজনের দিক। মূলত রবীন্দ্রনাথের 'অপ্রয়োজনের আনন্দ' জাতীয় কথায় শিল্পের অহংকারকে খর্ব করা হয়, কেন না ঐ প্রয়োজনের দিক শিল্পের ক্ষেত্রে জরুরী। ভিন্নতর কিছু নেই। মার্কসীয় নন্দন তত্ত্বের মূল কথাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ফারাক অনেক। আমি শিল্পবস্তুকে প্রয়োজনের দিক থেকে মূল্য নিরূপণে বিশ্বাসী।

জীবনের প্রাত্যহিকতায় প্রয়োজন আছে শিল্পের, কবিতার। আমাদের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্মতম বিস্তৃতি ঘটাতে থাকে শিল্প। ভোগের দিকে, তৃষ্ণার দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করে, আর সেই ভোগ বা তৃষ্ণা মানুষকে করে জীবন সম্পর্কে সচেতন, আগ্রহী, উদ্‌গ্রীব। মরণসীমিত জীবনতা উদ্দেশ্যহীন মাথা না ঠুকে একটি উদ্দেশ্যের, লক্ষ্যের সন্ধান করে নিয়ত; শিল্পে সেই সন্ধানের আর্তি, উৎকণ্ঠা আর উপলব্ধির বহুতল উন্মোচন ঘটে। যে সময়বলয়ে শিল্পীর শারীরিক উপস্থিতি তার বৃত্তে আবর্তন তাঁর নিয়তি; ফলত তিনি অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কোরে চলেন ইচ্ছেমত রচনায়—তা ছবি হোক, কবিতা বা গদ্যশিল্প, সব মাধ্যমই এই অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় জীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলে। যেহেতু, জীবিতের বহু-বর্ণিল বহুস্তর বিন্যস্ত জীবনতাই শিল্পে ব্যাখ্যাত হতে থাকে, অতএব হয়ে পড়েন তিনি একটি দর্শনেরই উদ্ভাবক ও প্রবক্তা; অবশ্যই এই দর্শন যুক্তিমার্গিকও নয়, ভাবসম্বন্ধীও নয়; বরং উপলব্ধির অতলাশ্রয়ী কম্পন নিরন্তর এখানে স্পন্দিত হতে থাকে, এ কারণেই শিল্পীর সংকট থেকে ত্রাণ মেলে না। যুক্তিমার্গিকের সিদ্ধান্তে পৌছোলে কাজ শেষ, আর ভাববাদীর আত্মনিবেদনে চরিতার্থতা। কিন্তু শিল্পী যেহেতু এ দুয়েরই বিরোধী, তাকে তাই বৃহত্তর সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। সমস্যার পর সমস্যা, অন্তহীন সমস্যা; সমাধান তাঁর অজানা আর এখান থেকে তাঁর যাত্রা বলে তার পীড়নকালেরও শেষ নেই! তাই দেখি, শ্রেষ্ঠ শিল্পে কোনো :সমাধান নেই, আছে সংকটের নিয়তবিস্তার; তবু এতেই শিল্পীর আনন্দ; এক অনিশ্চিতি থেকে অন্য এক অনিশ্চিতির মধ্যে ঝাঁপ দিতেই তাঁর সকল আগ্রহ।

ভাষাশিল্পীর পক্ষে মাধ্যম শব্দ, শব্দের রহস্য, বলা যায় একমাত্র অস্ত্র তার হাতে। আর উপলব্ধির বহুস্তর প্রকাশেব জন্য তাকে অন্যান্য শিল্পআঙ্গিক থেকে ধার না নিলে চলে না। অবশ্যই যে কোনো আঙ্গিক থেকে যে কোনো উপাদান নিই না

কেন তা প্রকাশের মাধ্যম ঐ শব্দ ; আর শব্দেরও অপরিসীম প্রকাশ শক্তি। যখন বলতে পারছি না কিভাবে সবচেয়ে সূক্ষ্ম ইংগিতে জানিয়ে দেবো আমার অনুভূতির আবেগ, হাতড়ে ফিরছি বক্তব্যের তাড়নায় ; একটি মাত্র শব্দ তার বহুস্তর অনুষঙ্গ নিয়ে জ্বলে ওঠে সেই মুহূর্তে, আর সঙ্গে সঙ্গে অপরিমেয় আনন্দে বেজে ওঠে আত্মা ; গয়টে এই অভিজ্ঞতার কথাই বলেছেন : **For just when ideas fail, a word comes in to save the situation.**

কেন হয় এমন ? বিষয়ের গুরুত্ব যদি থাকে, প্রকাশ হলেই তার লক্ষ্যভেদ ; হ'তো যদি এই রকম, কতো সহজেই শিল্পীর দায়িত্ব ফুরিয়ে যেতো ; তাহলে সমাজ সংস্কারকের ভাষণ শিল্প বলে মর্যাদা পেতো, শিল্পের গুরুত্ব থাকতো না ; কেন না, শিল্পী যা আছে তাই দিয়ে যা নেই তাই নির্মাণ করেন ; হয়তো প্রেরণাতাড়িত হয়ে, হয়তো নয় ; কিন্তু শব্দ—তাৎপর্যে জ্বলন্ত শব্দ, অনুষঙ্গ-বিস্তারী শব্দ নিয়ে নির্মাণ করেন ভাষাশিল্পী এমন এক শিল্প বস্তু যেখানে বিষয়ের গুরুত্ব রূপের দাক্ষিণ্যে রাজকীয় মহিমায় জ্বলতে থাকে ; তুচ্ছ পায় অসীমতার সংকেত, ভয়ংকর হয়ে পড়ে নিবেদনে নমনীয় ; আর পাশাপাশি বৈপরীত্যের অবস্থান কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, বরং প্রাকৃতিক সংগতি পেয়ে রহস্যকে বহুদূর ছড়িয়ে দিতে থাকে মাত্র।

মিনা কাউট্স্কিকে লেখা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের চিঠিটি মনে পড়ছে। তাতে শিল্পীর কৃত্য প্রসঙ্গ অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। তাতে তিনি শিল্পীকে, যা আছে তাকে বিশ্লেষণ করতেই উপদেশ দিয়েছেন, কি করা উচিত—প্রসঙ্গ, শিল্পস্রষ্টার অবশ্যপাল্য কর্তব্যরূপে নির্দেশিত হয়নি ? দেখা পরিস্থিতির মধ্যে জড়িত ব্যক্তির সংকট ও আত্মবীক্ষণ শিল্পের পক্ষে জরুরী ; এ শর্তকে মান্য না করলে যা সৃষ্টি হবে তা জীবনানন্দের ভাষায় একান্ত বুদ্ধির রস কিংবা কল্পনার আত্যন্তিকতাপ্রসূত এমন এক ব্যাপার যা এতাবৎ চর্চিত ও নিন্দিত হয়েই এসেছে। আমাদের বাংলা ভাষায় এমত বুদ্ধির যুক্তিতে যা লেখা হয়েছে, পড়ে না তা আজ আর কেউ—বিদ্যালয়ের গবেষক ছাড়া। ভারতচন্দ্র কিংবা ঈশ্বর গুপ্ত বুদ্ধিকে কবিতার প্রাথমিক শর্ত বলে জানতেন, ইংরেজী সাহিত্যে পোপ যেমন ; আবার কল্পনার বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিহারীলাল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সমস্যাটাকে এড়িয়ে সংকল্পকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এঁরা, বিষয়কে বিষয়ীর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোরে দেখার যে আধুনিকতা তা এঁদের অজানা ছিল। মোটামুটি বিষয়কে ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে আলাদা ভাবায় স্বস্তি পেলেন। যেন কবিতার

অন্যনিরপেক্ষ একটি ভূমিকা আছে, যা মাত্রই কল্পনাকে মুগ্ধ করতে কিংবা বুদ্ধির দ্বারা পাঠককে হকচকিয়ে দেবার জন্যই কাজে লাগে। শিল্পে ব্যক্তির সমস্যাকে জড়িত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু সেখানেও এককেন্দ্রিক ব্যক্তির আধিপত্য ; 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ 'আর চুনি উঠলো রাঙা হয়ে' এই চেতনা ব্যক্তির মাত্রাতিরিক্ত আধিপত্যের ইচ্ছা প্রকাশের আশঙ্কা মাত্র। যে ব্যক্তি বহুর সম্পর্কে অন্বিত বলে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে নিরন্তর, তার ব্যর্থতা ও সাফল্য একমাত্র তারই নয়—এই বোধ থেকে বিশ্বসঙ্ঘের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথে দেখি না। 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না'—রাবীন্দ্রিক এই উচ্চারণে যে বাস্তবিকতার দাবি সাঙ্গীতিক মাধুর্যে সোচ্চার হয়েছে, তাঁর কবিতায় সে দাবি কিন্তু উপেক্ষিত বলে মনে হয়। আজকের শিল্প সবধরণের আড়াল উন্মোচনে সাহসী ; এখানে ব্যক্তি ব্যক্তিরই মুখোমুখি সপ্রশ্ন, সংঘর্ষকামী ; ব্যক্তি সমষ্টির সঙ্গেও অল্পবিস্তর সংঘর্ষে রক্তাক্ত ; আর সমাজনামীয় কাল্পনিক নির্বস্তুর সঙ্গেও তার বিরোধ ; বিশেষ কোরে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থায় অস্তিত্ব সর্বদাই রক্তবমনে অস্থির, মৃত্যুগামী ; নিরাপত্তাহীনতা তার সৃষ্টিশক্তিকে পঙ্গু করে, কর্মশক্তিকে নিরুৎসাহ কোরে দেয় ; বুর্জোয়া বিকাশের যুগে যে শিল্পকলার চরম উৎকর্ষ হয়েছিলো, তাতে কি বুর্জোয়া ব্যবস্থার স্বতঃস্ফূর্ত জয়গান দেখতে পাই ? না ঐ ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের সংখ্যাহীন সমস্যাই মৌল বিষয় ? অন্তত পরোক্ষভাবেও শিল্পীমাত্রই সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনাই করেছিলেন। তাই সেকালের ইতিহাস অর্থনীতি বিশ্লেষণে এই উন্নত মানবতাবাদী শিল্পীদের সাহায্য নিতে দেখি মার্কস এঙ্গেলসকে। এখানেই সত্য রয়েছে। শিল্প বিচারের চূড়ান্ত দৃষ্টিকোণ, যে ব্যবস্থার মধ্যে একজন মানুষ হিসেবে নানা দায়ে পীড়িত শিল্পীর অবস্থান, তিনি তো তা থেকে অভিজ্ঞ হচ্ছেন ক্রমশঃ, ব্যবহার করছেন এই সব উপাদান যা তাঁর চারপাশে ভাঙছে গড়ছে, পরিবর্তিত হচ্ছে ; গৃহীত আর বর্জিত হচ্ছে, হন যদি তিনি নিপুণ শিল্পী, দেখা তাঁর বেদনায় হবে স্নাত, সহানুভূতিতে দ্রব। রাশিয়ার সার্ফদের জীবন যাত্রার অন্তর্গত ছবি টলস্টয়ের মতন কে আর দেখাতে পেরেছেন, আর এ কারণেই টলস্টয়ের প্রতি ম্যাক্‌সিম গোর্কীর অভিনন্দন আর অভিযোগ সীমাহীন। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়ার বাস্তব চিত্র ডস্‌টয়েভ্‌স্কি, গোগোল, চেখব যে ভাবে ধরে রেখেছেন তা পাঠান্তে বলতে ইচ্ছে করে, **My peace is gone, my heart is heavy.**

নির্বিচারে দেখা আর উপলব্ধির শর্তে প্রকাশ করাই শিল্প; আর দেখা—অর্থাৎ বর্তমানকে তো বটেই; অতীতের তাবৎ ঐতিহ্য যা মানুষের শ্রম, স্বেদ, বেদনার নির্মাণ, এইসব পাঠ আর প্রত্যক্ষভাবে জানার অভিজ্ঞতাও দেখা; এর মধ্য দিয়ে অর্জিত হতে থাকে অভিজ্ঞতা; আর মন্থিত, বিশ্লেষিত অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায় প্রজ্ঞা, যদি তা পাণ্ডিত্যের অভিমানী প্রকাশকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে সমমর্মিতায় রক্তোজ্জ্বল, অনুভূতির সূক্ষ্মতার মিশ্রণ সমন্বিত করতে পারে, [আর তা করাও উচিত] তবেই শিল্পীর দায় উপযুক্ত ভাবে পালিত হলো।

অতএব, শিল্প বিচারের মানদণ্ড—ঠিক ঠিক দেখা আর নিপুণশৈলীতে প্রকাশ করা। এতটা যদি করা সম্ভব হয়, বলবো—আমাদের পূর্ববর্তী মহান পূর্বসূরীদের কাছ থেকে নিয়েছি সঠিক শিক্ষা সবিনয়ে, আর চমৎকারভাবে পালন করলাম লেখক হিসাবে আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব। নিছক আনন্দ—কেমন তা? শিল্প থেকে তা কিভাবে পেতে পারি? যে কোনো আনন্দ প্রতিক্রিয়া জাত, তাই তা অকারণ হতে পারে না। আর বিষাদ—আছে তারও কোনো বাস্তবিক কারণ; হয়তো এ মুহূর্তে তার উদয় হয়েছে, ব্যাখ্যা করার মানসিকতা নেই; শিল্পে তার বারণ উল্লেখ, কি প্রয়োজন তার? এমনভাবে রূপবদ্ধ হলো কিনা যা সংক্রামিত হতে থাকে ক্রমাগত, ধ্বনিত হতে থাকে বারবার, স্পন্দিত হতে থাকে রক্তে, ধ্রুবপদের মতন ঘুরে ঘুরে আসে, ফিরে ফিরে চলে যায়। এমনতর ঘটনা সম্ভব, যদি, দেখা আর অনুভূত অভিজ্ঞতা বহু মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থাপন করে রক্ত চলাচলের সেতুপথ; প্রয়োজন হয়ে পড়ে মানুষের—যেমন নিঃশ্বাসের জন্য হাওয়া, তৃষ্ণার জন্য জল, তবে শিল্পের কাছে তৃষ্ণার্ত, শ্রান্ত, বিভ্রান্ত মানুষ না এসে পারে না। আর যে শিল্পীর কাছে এমত শ্রান্ত আত্মা বারবার আসে তিনি ততো বড়ো, বড়ো আর অনিবার্য; এড়িয়ে গেলে নিজেরই ক্ষতি, ক্ষতি মানব সভ্যতারও, ভুললে চলবে না।

কবির কাজ জগৎকে অনুভব করা, বদলানো তার কাজ নয়, সে সামর্থও তাঁর নেই, ইচ্ছেরও অভাব; আর এই বদলানোর ভূমিকা নেওয়াকে তিনি যদি দায়িত্ব বলে ভাবেন, তাহলে তিনি যাবেন কার্যকারণ সন্ধান আর বিশ্লেষণের দিকে, অর্থাৎ বিচার, যুক্তি আর সিদ্ধান্তের দিকে; তাতে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা পাঠক পাবেন হয়তো অনেক; তা স্মরণীয় হবে না, হবে, অধ্যাপক বা রাজ-নীতিজ্ঞের উপদেশ যেমন রক্তহীন, পাংশুটে আর বিরক্তিকর—তেমনি কিছু। হবে না অনিবার্য উচ্চারণ যা চৈতন্যকে অবিরল প্রখর কোরে যাবে, অনুভবকে

উপলব্ধির সমগ্রতায় দেবে উত্তীর্ণ কোরে; ব্যথিত, ক্লিষ্ট আত্মার অন্তর্মনের রহস্য অজানিত কে আর তেমন কোরে বাজাবে যিনি নিজে কখনো বাজেন নি? কবি নন বিচারক; কেননা তিনি নিজেই পাপী, অন্তত সকল পাপের অংশগ্রহণে উন্মুখ তিনি স্বেচ্ছায়; তিনি করেন না অভিযোগ, কেননা নিজেই জন্মসূত্রে অভিযুক্ত; দায়ী করেন না তাঁর কর্মের জন্য অন্যকে, কেননা, মনে করেন নিজের আর সকলের কৃতকর্মের দায়ভাগী তিনিও; মমতায়, স্নেহে, কারুণ্যে দ্রব হতে থাকেন তিনি; মানুষকে দেখেন বেদনাদীর্ণ অসম্পূর্ণ সত্তার প্রতীক হিসেবে; ভালোমন্দে, পাপে পুণ্যে সমগ্র হয়ে ওঠে মানুষ। তাঁর দেখা এই মানুষকেই। অন্তত আজকের কবি নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন না ওই জননী থেমে আলাদা কোরে, যে মৃত শিশুকে পথের পাশে শুইয়ে রেখে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করছে। দেখেন তার সঙ্গে নিজেকে, এমনই সাড়া দেবার তাঁর আগ্রহ আর প্রস্তুতি চলছে অবিরল; এই সংসক্ত দেখা তিনি শব্দে শব্দে স্পন্দিত করতে অবশিষ্ট জীবন ব্যয় করেন, এতেই তাঁর আনন্দ; দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাওয়াই তাঁর দুরপনেয় প্রতিজ্ঞা।

> আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না—তবু
> দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে।
> আমরা দণ্ডিত হ'য়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
> মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

কবিতা ঃ পঁচিশ বছর

মনে পড়লে বিস্ময় ও বেদনা চিন চিন কোরে বেজে ওঠে, মনে হয় কতদিন আগের, যা ইতিমধ্যে ইতিহাসের ধূসরতায় ইতিহাস হয়ে গেছে; দেখতে দেখতে সদ্য স্বপ্নকাতর বালক হাজার হাজার ছিন্নমূল আতঙ্কগ্রস্ত সর্বস্ব হারানো মানুষের সঙ্গে ভয়ে, বিস্ময়ে, উৎকণ্ঠায় পূর্ববাংলা ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলাম—তা প্রায় পঁচিশ বছর আগে; ষ্টেশনে ষ্টেশনে অগণিত নারী পুরুষ বৃদ্ধ শিশুর আর্তনাদ; ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্ন, গ্রস্ত তারা; স্বপ্নে নয়, অনিশ্চয়তার আতঙ্কে, আমিও তাদেরই মধ্যে মিশে আছি, সবকিছু বুঝে ওঠবার বয়স নয় তখন। তথাপি বুঝেছিলাম একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে—এমন একটা কিছু যা বহুকাল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধোরে জীবনধারাকে উচ্ছিন্ন করতে পারে, মানুষকে ঠেলে দিতে পারে নিত্যমুহূর্তের আশংকায়, উদ্‌বেগে—ক্রমশ মৃত্যুর দিকে—সশব্দে।

সেই আমি কলকাতায়। কলকাতা আমার স্বপ্নের, আমার আশার, আনন্দের— ; হলো যখন প্রথম পরিচয়—শিয়ালদা ষ্টেশনে লক্ষ লক্ষ মানুষ, মানুষ বললে হয়তো মনুষ্যত্বের অপমানই করা হবে; ছেঁড়া চটের তাবু, শুকনো স্তনে মুখ গুজে পড়ে থাকা শিশু, কানি পরা সদ্যস্ফুট যৌবনা যুবতী, কর্কশ নিষ্ঠুর চীৎকার, ট্রামের শব্দ, বাসের হর্ণ বাজার শব্দ; ভলান্টিয়রদের মুহুর্মুহু সাবধান বাণী, আশার নিয়ন জ্বালানো আর নেভানো; কুকুর আর মানুষের সামান্য খাবার নিয়ে টানাটানি—এই আমার স্বপ্নের কলকাতার সঙ্গে এই ভাবে দেখা হলো; এখনো মনে আছে, তাতে স্বপ্ন ভংগ ঘটলো না তেমন, কেননা দশ বছর বয়সে তার সময়ও নয়—তখনো সে সব কিছুর মধ্যেই সঙ্গতি খুঁজে নিতে পারে; কোনো দুঃখকেই বড়ো কোরে দেখার মানসিকতা গড়ে ওঠে না তখনো—আমি তাই কলকাতাকে নিয়ে মেতে উঠেছিলাম—সেই শৈশবেই।

আমার যখন জ্ঞান হলো, যখন বুঝতে শুরু করলাম সাহিত্য,—তখন আমার কাছে কবিতাই একমাত্র—তাকে ভালোবাসা কখন কোন সূত্রে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে; যার নিঃশব্দ অমোঘ টানে রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি,

পথে পথে ঘুরছি ছন্নছাড়া ভাবনায়—স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। সময়টা তখন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাল ; স্কুলে বসেই আধুনিক কবিদের কারো কারো কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেছে, আর আমি তখন লিখছি, অনুকরণ করছি সুকান্ত। যাদের মনে আছে, ভাবুন সেই মধ্যপঞ্চাশের কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের তীব্রতা ; পার্কে পার্কে ষ্টল, সভা—লাল শালুতে কাস্তে হাতুড়ি তারা দেখার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যম, আশা—ভবিষ্যৎ দুলে ওঠা—আমাদের মতন কিশোর তখন মাতাল, কিছু একটা করতে হবে—সুকান্ত আমাদের অনেকরই প্রেরণা যোগাচ্ছেন, মাঠে ময়দানে সর্বত্রই সুকান্তের ছাড়পত্র, মোরগ, বোধন ; নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা বিরামহীন ; পক্ষপাতী হয়ে পড়ার ইচ্ছা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কিছু কিছু সাফল ইত্যাদি আমাদের তখন মাতাল কোরে রেখেছিলো।

আছে কি এইসব ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলা সহিত্যে, কবিতায় ? তর্ক উঠবে, ঘটনা—যদি তা সদ্যজাত—যদি সাহিত্যে হয়ে উঠতে চায় শরীরী, তাতে স্থূল কিছু তাৎক্ষণিকের চিহ্ন লেগে থাকে ; তা সূক্ষ্ম তাৎপর্যে স্থির হতে পারে না। পক্ষে বা বিপক্ষে নানা অভিমত রয়েছে—তাতে প্রবেশ না করেও আমাদের বাংলা কবিতায় স্বাধীনতা উত্তর পঁচিশ বছরের দিকে তাকালে একটা চেহারা উঠে আসে, নানা বিষয় ও উপস্থাপনার রীতি এসময়ে পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে, এটা সংশয়াতীত দেখতে পাচ্ছি।

পঞ্চাশের যারা তরুণ লেখক তাঁদের সঙ্গে আমাদের কিশোর বেলায়ই পরিচয় হয়েছে ; কেননা তাঁরা ছিলেন আমাদের খুব কাছের, ধরাছোঁয়ার মধ্যে ; আর সপ্রতিভ, জীবন্ত। তখনো সেই বয়সে পা দিইনি যখন বিষ্ণু দে-র বৈদগ্ধ্য বুঝে ওঠা সম্ভব, সুধীন্দ্রনাথের মনীষাচর্চা ; তথাপি এটা আমাদের কোনো কোনো অগ্রজ কানে তুলে দিয়েছিলেন সংবর্ত কিংবা উর্বশী ও আর্টেমিস, পারাপার, ধূসর পাণ্ডুলিপি, ফেরারী ফৌজ আর পদাতিকের কথা। আবিষ্কার নয় ; দূর থেকে—বহুদূর থেকে অস্পষ্ট মহাদেশ দেখার মতন বিস্ময়, ভয় ও শ্রদ্ধা সেই প্রথম জাগতে শুরু করলো ; বুঝতে শুরু করলাম—রবীন্দ্রনাথের পরে আর সুকান্তর সমসময়ে বাংলা কবিতা কী ভীষণ বদলে গেছে, বদলাচ্ছে প্রতিদিন। এ এক বিমূঢ় করা অনুভূতি যা আমাকে পাগল করেছিলো। দেশপ্রিয় পার্কের পাশে অধুনালুপ্ত সিগনেট প্রেসের সুসজ্জিত বিপণি আমার চোখের সামনে তখন অনাবিষ্কৃত মহাদেশের দরজা খুলে দিচ্ছে প্রতিদিন। দরিদ্র, হতচকিত কিশোর ক্রয়ের ছল কোরে এ-বই ও-বই নেড়ে চেড়ে দেখে ; দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে, ঈষৎ

সঙ্কুচিত লজ্জায়—পরে কিনবো এমন ভান কোরে পথে নেমে দ্রুত পায়ে পালালো—এসব দৃশ্য স্পষ্টই মনে আছে।

ওখানেই কিনে ফেললাম সংবর্ত, উর্বশী ও আর্টেমিস আর সমর সেনের কবিতা, ধূসর পাণ্ডুলিপি আর বনলতা সেন; কয়েকজন সতীর্থ মিলে অবিরল পাঠ; স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারছি প্রথম পাঠের অভিজ্ঞতা,—এখনো বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে; অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি পড়ে মনের মাটিতে; অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়, আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে; ছাদে যেওনাকো ওখানে আকাশ অনেক বড়ো সীমানাহীন; বলো আইসায়া, এতো দুর্যোগ ছিলো কোথায়; যমও নেয় না তাকে আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে।'—এসব পংক্তি ওই লেখককের নানা গ্রন্থ থেকে কখন অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে গেলো। এঁরা সবাই ত্রিশের আন্দোলনের সংঙ্গে যুক্ত, আর বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী—কেন জানি না—তখনই মনে হয়েছিলো অনবদমিত আবেগের, অবাধ উচ্ছ্বাসের কবিতা; অভিজ্ঞতার পুঁজিও বড়ো অল্প,—তাই বিষয় একঘেয়ে প্রেম, তবু—তাঁর ব্যক্তিত্ব বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক সকল আয়োজনকে স্পর্শ কোরে আছে। এরই সমসময়ে সমর সেন আর সুভাষ সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকের কথা বলে হালকা চালের ব্যঙ্গে ও সহানুভূতিতে দ্রব কোরে আমার অস্তিত্বের চারপায়ে গুঞ্জন কোরে ফিরতে লাগলেন। ঐ ভয়ংকর টালমাটাল রাজনৈতিক পটবদলের সময় স্থির বিশ্বাসে কবিতার বিশুদ্ধতা রক্ষা কোরে চলেছিলেন হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ সরকার, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, অরুণ ভট্টাচার্য। এঁদের কবিতা বুদ্ধদেবীয় রোমান্টিক ভাবালুতায় আচ্ছন্ন, তবু চমকে দেবার মতন পংক্তি বা একটা আস্ত কবিতাই এঁরা লিখে ফেলছেন। মঙ্গলাচরণের 'আমার দিনমান আপন মনে শুধু মনের পথ হাঁটা'—বার বার ঘুরতো ফিরতো, আর কেনো জানিনা, সুভাষের প্রতি তখন বিরূপই ছিলাম আমি, হয়তো একারণে, সুভাষ এক অনতিক্রম্য কবিব্যক্তিত্ব অর্জন করেছেন, তাঁর অনুকারকের সংখ্যা গণনাতীত; সেই সময়ই তরুণতম অপাপবিদ্ধ বালক সুভাষকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলো, নানা লেখায় বিরূপ মন্তব্য করেছি। এখন বুঝি—প্রবল-ভাবে স্বীকৃত ছিলেন সুভাষ আমার মধ্যে যদিও বুঝেছিলাম—এও এক নতুনতর কথনভংগি—প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে কবিতার মিলেমিশে থাকার দুর্লভ অথচ আয়ত্বাধীন কবিতা—তাঁর।

চল্লিশের কবি বলে আমরা আজ যাঁদের চিহ্নিত করেছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ সরকার, নরেশ গুহ, অরুণ ভট্টাচার্য, রাম বসু, তাঁদের তাজা কবিতা তখন প্রায়ই প্রকাশ হচ্ছে; সুভাষের কবিতা নিচ্ছে ভিন্ন বাঁক, নদীর তীব্রতা শান্ত মোহনা স্পর্শে ব্যাকুল; আর দিনেশ দাস ভুখ্ মিছিলের চরিত্র খুঁজে পাচ্ছেন না, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুখোশ' তখন স্মৃতি, অবশ্য বিরামহীন লেখনী চালনায় সময়কে, সমস্যাকীর্ণ মধ্যবিত্তের অস্তিত্বকে স্পষ্টতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করছেন; মঙ্গলাচরণ সাম্যবাদ আর ব্যক্তিক অবস্থানকে শিল্পের শর্তে মেলাতে যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাতে যখন তাঁর সাফল্য চোখে পড়ার মতন তখনই তিনি নীরব হয়ে গেলেন, এক অর্থে পাঠক চোখের অন্তরালে। চল্লিশের সাধারণ কবিচরিত্রই ছিলো বিপ্লবের।—রাশিয়ার অর্থনীতিক সাফল্য, আমাদের উদ্দীপিত আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলা, মন্বন্তরের তীব্র দুঃখকর অভিজ্ঞতা, দেশবিভাগের ভয়ংকর দিনগুলোর স্মৃতি,—দেশে দেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের জয়-পরাজয় ইত্যাদি। এই সব নিত্য-সঙ্গী জীবনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে, অথবা শিল্পের প্রয়োজনে অস্বীকার কোরে পরিত্যক্ত রোমান্টিকতার গুহায় যাঁরা আশ্রয় খুঁজলেন, তাঁদের কাছে আমাদের দাবী রইলো না কিছু। সমসাময়িকতায় অন্ত্যজ-ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার এই প্রবণতা তাঁদের নির্বাসিত জগতের অধিবাসী কোরে তুলেছিলো; এবং মনে হয়েছিলো—এঁরা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত obsolete ধারাটিকে রক্ষা কোরে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক—বলাকা, পুনশ্চ, সেঁজুতি, নব জাতকের রবীন্দ্রনাথকে এঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি। স্পষ্ট এই রক্ষণশীলতা তখনই আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল, আর তখনকার, পঞ্চাশ ও ষাটদশকের গোড়ার দিকে রাজনীতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও এ সব রচনার দিকে মনোযোগের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেনি। জীবনানন্দ যখন বেলা অবেলা কালবেলার ভয়ংকর প্রেম অপ্রেম সম্ভূত কবিতাগুলো লিখছিলেন, তখন যাঁরা তরুণ, যাঁরা তারুণ্যের সীমা পার হচ্ছেন, তাঁদের রচনা যখন পাশাপাশি পাঠ করি, অভিযোগে সরব না হয়ে তখন পারি না, কি কোরে একই সময়-প্রকৃতির অধিবাসী হয়েও সস্তা রোমান্টিকতায় গা ভাসালেন তাঁরা। সময়কে, সময়ের অন্তরালবর্তী সমস্যাকে গভীর গোপন উপলব্ধিতে শুষে নেবার যে তাড়না, মহৎ কবিকে তা আত্মপ্রকাশে ব্যাকুল কোরে তোলে, হয়তো গৌণ

কবিদের তা করে না; তাই সহজিয়া কবিত্বে তাঁরা মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন নির্দ্বিধায়। বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিকতার উন্মেষ কালে নারীস্বাধীনতার আন্দোলনের দিনগুলোয়, এক অর্থে নিজেকে বাজী রেখে অনুভূতি ও প্রজ্ঞায় যিনি অবহেলিত নারী সমাজের গুহাহিত বিষাদের কারণ অনুসন্ধান কোরে চলেছিলেন বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনার কবিতায়; অনুরূপ সময়, দেশকাল পরিধির মধ্যে বিহারীলাল কেমন সরস্বতীর ধ্যানরূপ প্রত্যক্ষ করার কবিয়ানায় ব্যাকুল। আর, বীরাঙ্গনা, চতুর্দশপদী রচিত হয়ে যাবার পরেও দেবেন সেন, অক্ষয় বড়ালের আগমন বোধ হয় এদেশেই সম্ভব। হয়তো, রবীন্দ্রনাথকে আমরা সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করাবো, তাতে অসুবিধেও দেখি না, কেননা—তিনি, কিংবা তাঁর কাছে এসেই আর একবার বাংলা কবিতার পৌরুষ শাঁখাপরা নম্র স্থির বধূর শুদ্ধ সুস্থিরতায় পরিণাম পেলো। ভেবে দেখুন, আমাদের ঐতিহ্যে পৌরুষ, মানবীয় তাবৎ অস্তিত্বগত অনুভূতি কী ভীষণ ভাবে স্বীকৃত হয়েছিল বড়ু চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের খণ্ড কবিতাগুলিতে। রাধা আর নমনীয় ভাবের বাহক ছিলো না সেখানে, কামনাকীর্ণ যুবতী; কৃষ্ণ এক আদিমতাতাড়িত যুবক—সকল কালের মানবীয় অস্তিত্বের সংকটে তারা মুখোমুখি, আর কী জীবন্ত বড়াই নামীয় বৃদ্ধা দূতীটি পর্যন্ত; এমন কি মঙ্গলকাব্যেও দেবতাকে আমরা মানুষই কোরে তুলতে পেরেছিলাম; তাতে সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের নানা সংকট, আশা আশাভংগ জীবন পেয়েছিলো। আমাদের মূল ধারাটি রক্ত মাংসের দাবীকে কখনো অস্বীকার করেনি, বরং একটু বেশীই স্বীকার কোরে নিয়েছিলো। এ ব্যাপারে ফরাসী সাহিত্যের সাধারণ চরিত্রের সঙ্গে মিল অনেক বেশী। শিবনারায়ণ রায় যে অভিযোগ করেছিলেন, তা যে অনর্থক নয়, তার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে তা ভেবে দেখবার মতন!

রোমান্টিক ভাবালুতার আওতায় আমরা জীবনের চাইতে কল্পনাকে বড় বলে ভাবতে শিখেছি; ভিক্টোরীয় ঔচিত্যবোধে দীক্ষা নিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে সত্যের চাইতে শ্লীলতা বেশী মূল্যবান। আমাদের সাহিত্য-কল্পনা পুষ্ট হয়েছে স্কট—ওয়র্ডস্‌য়র্থ—টেনিসন-ডিকেন্সের ঐতিহ্যে। ফলে আমাদের লেখকেরা মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের অনুধাবন না করে তার ভাবরূপটিকে নিয়ে মশগুল হয়েছিলেন। শুধু হয়েছিলেন না, বাংলার অধিকাংশ লেখক আজও সে মোহ কাটাতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে

তারাশঙ্কর, রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু, এঁরা সককেই কম বেশী এই রোমান্টিক ভিক্টোরীয় ধারার লেখক।

আধুনিকতা, যেখানে সামগ্রিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে, সেখানে তা বহুব্যাপ্ত, অন্তরালাশ্রয়ী চৈতন্যের বিশ্লেষণে, উপলব্ধিতে জীবন্ত হয়ে উঠবে ; পরিবর্তে যদি বাধানিষেধের হাজারো গণ্ডীতে, শুচিবায়ু আর সংকীর্ণতার চাপে প্রাণশক্তি পদে পদেই হতে থাকে আহত, তবে সাহিত্য এক ধরণের নিষ্প্রাণ নীতিতত্ত্বে চরিত্র হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে ; বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ধারা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায়ের মন্তব্য যথার্থ। অথচ শুরুতে আমাদের সাহিত্যের এ হাল ছিলো না ; মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে ধুলো ধূসরিত জীবন উপেক্ষিত হয়নি ; বৈষ্ণব কবিতার দার্শনিক আবরণটি খসিয়ে দিলে যে শরীর উন্মোচিত হয়ে পড়ে তা আর যা-ই হোক—রক্ত মাংসের মানুষের কামনা বাসনার স্পন্দনহীন কোনো দার্শনিক হাহাকার নয় ; আর ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগই থাক না কেন, তিনি কাব্যরচনার উদ্দেশ্য হিসাবে দেবতার স্তুতি যে প্রার্থনা করেন নি, তার মূল কারণ আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য রাজকীয় ঔদার্য প্রার্থনা—অর্থাৎ একান্তই ইহজাগতিক ব্যাপার, তা অতি বড় তত্ত্বজ্ঞও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই অন্নদা মঙ্গলের হরগৌরীর গার্হস্থ্য বর্ণনায় দেব মহিমার এমন দারিদ্রজর্জর বাঙালী জীবনের বাস্তব ছবি ফুটে উঠতে পেরেছে।

আমাদের ভাষার যিনি প্রথম আধুনিক, যাঁর হাত থেকে বিশ্ব-ঐতিহ্যের সারাৎসার পরিবেশিত হলো প্রথম, প্রথম রেনেশাঁসের মূল চরিত্র যিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই মধুসূদনও বাস্তব জীবনের দাবিকে শুচিবায়ুগ্রস্তের উন্মাদ সংকীর্ণতায় বর্জন করেন নি, অন্তত দু'দুটি প্রহসন, বীরাঙ্গনা তার প্রমাণ। আর দীনবন্ধু ? এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা অনুকরণীয় ছিলো ; কিন্তু তা আর হলো না। কেননা—ইতিমধ্যে ব্রাহ্মদের আধিপত্য শুরু হয়ে গেছে। আর শ্রীযুক্ত রায় যে খৃষ্টান মিশনারীদের নীতিজ্ঞতার প্রভাবের কথা বলেছেন তারও দাপাদাপি শুরু হলো। ফলত বাংলা ভাষা ও লেখার যোগ্য বিষয়—উভয়ক্ষেত্রেই উচ্চবিত্তের সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়লো, জীবন তার বিচিত্র ব্যাপ্তি ও গভীর অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি ফেললো হারিয়ে। রবীন্দ্রনাথের অর্ধশতাব্দী জুড়ে সাহিত্য চর্চায় এই রুচির উৎকর্ষ তুঙ্গে আরোহণ করলো, সকল অন্ত্যজের স্পর্শ বাঁচিয়ে তা সূক্ষ্মতা ও গভীর দার্শনিকতার চমৎকার উদাহরণ

হলো, হারিয়ে বসলো বাংলা সাহিত্যের প্রধান জীবিতসত্তার অস্তিত্ব বর্ণনার ধারাটি। এ অভিযোগের সত্যতা অস্বীকৃত হলে সত্যেরই অপলাপ করা হবে; আর, সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, কল্লোলে সমবেত কতিপয় প্রতিভাবান তরুণ যে সামগ্রিক বৈপরীত্যের সমন্বয় সাহিত্যে ঘটাতে চেয়েছিলেন তাও পূর্ণ পরিণতি পেলো না; বরং শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতামণ্ডিত জীবনচর্যা ভিন্ন পোশাকে ফিরে আসতে লাগলো; এরই প্রতিক্রিয়া কি সাম্যবাদী চল্লিশের সাহিত্য? প্রতিক্রিয়া না হলেও তৎকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর মার্কসীয়, ফ্রয়েডীয় মূল্যবোধের চাপে উনিশ-শতকীয় চিন্তা-চেতনার বিপর্যয় যে নতুনতর পথে পদচারণার স্বপ্ন এবং কিছুটা তাড়নাও এনে দিয়েছিলো, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। ত্রিশের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ ছাড়া সকলেই রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটাবার জন্য ভিন্নতর ঐতিহ্যের কাছে হাত বাড়িয়ে অনেকটাই প্রকারান্তরে শুচিবায়ুগ্রস্তের পরিচয়ই দিয়েছিলেন। জীবনানন্দ, কোনো বেগবান কিংবা ফলবান আদর্শ, তা দেশীয় বা আন্তর্দেশীয় হোক না, পুরোপুরি স্বীকার না কোরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে, তাবৎ শুচিবায়ুকে পরিহার করেছিলেন; তাঁর কবিতার মধ্যে যে টেনশান, যে মধ্যবিত্তের সংকট, দেশকালের সমসাময়িক গূঢ় সমস্যার শিল্পসম্মত চেহারা চমৎকার পরিণতি পাচ্ছিলো, হয়তো জীবনানন্দকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে সে বিষয়ে ইংগিত ছিলো, আর সিরিনিটির যে অভিযোগ জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তুলেছিলেন তারও কারণ; প্রসঙ্গত জীবনানন্দের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত চিঠিটি স্মরণ করুন: 'অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই 'জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা Serenity জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্যধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy'র ভেতর কিংবা শেলীর ভেতর Serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এদের রচনার ভিতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের নানা সময় নানা রকম

mood খেলা করে।…Mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে তাতে Serenity অনেক সময়ই থাকে না—কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।'

প্রশান্তি ছাড়াও মহৎ কবিতা হতে পারে, জীবনানন্দের এই মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি চার-এর দশকের কবিদের একাংশ বুঝে উঠতেই পারেন নি, আর সেটা এমন সময় নয়—চারপাশের opposite-এর একটা ব্যালান্স খুব তড়িঘড়ি কোরে ফেলার ; ফলত প্রকারান্তরে শুচিবায়ুগ্রস্ত হলেন তাঁরা। বিপরীতে সাম্যবাদী বলে প্রচারিত কবিদের মধ্যে একপেশে সরলীকরণের পৌনঃপুনিক চর্চা শুরু হলো। এই দুটো দৃষ্টিই সংকীর্ণ, তাতে মানুষের অবস্থানগত অস্তিত্বের ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা সজীব হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না, বেড়ে উঠতে অক্ষম ; তাই দেখি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলাচরণ আর প্রথম দিকের দিনেশ দাসের সফলতা, সুকান্তের তো বটেই—চর্চিত বহুচর্চিত হতে হতে তাবৎ আক্রমণের ক্ষমতা হারিয়ে বসলো ; উত্তরসূরিরা বুঝলেন না—সাহিত্য কোনো দার্শনিকতার সরলীকরণ মাত্র নয়, তাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মিশ্রণও প্রয়োজন। না বুঝে, প্রকরণের একটু হেরফের ঘটিয়ে প্রগতিশীলতাব ছাপ সম্বল কোরে টিকে থাকতে চাইলেন কেউ কেউ। ব্যক্তিগতভাবে কখনো কখনো দু'চারটে ভালো কবিতার জন্ম যে এঁরা দিতে পারেন নি তা নয়—কিন্তু উত্তরণের পথের হদিশ পেলেন না। তাই পঞ্চাশোর্ধ্বে এসে মণীন্দ্র রায় নিজের মাটি খোঁজার জন্য আকুল হয়ে পড়েন আর আঁকড়ে ধরেন তরুণতম কবির আবিষ্কৃত দীর্ঘ কবিতার নতুন পদ্ধতি ; কেউ কেউ নীরব হয়ে যান, কেউ বা আত্মসন্তোষে পারিবারিক সুখে গা ডোবান।

আমরা, যারা ষাটের গোড়ায় খুবই তরুণ, সাহিত্য নিয়ে উপরিতলের আলোড়নে সাড়া দিতে শুরু করেছি মাত্র, দেখেছি, এখন যাঁরা পঞ্চাশ দশকের কবি বলে চিহ্নিত তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। যে তিনটি পত্রিকায় পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের তাবৎ কবিতা-লেখক মিলিত হয়েছিলেন, সেই শতভিষা কৃত্তিবাস আর কবিপত্র—সর্বত্রই অলোকরঞ্জন ছিলেন সম্মানিত অতিথি ; অতিথি বলবো এ কারণে, কোনো পত্রিকায়ই তিনি শারীরিক ভাবে যুক্ত থাকেন নি। অবশ্য মনোধর্মে তাঁর সামীপ্য ছিলো শতভিষার সঙ্গে ; পরে কৃত্তিবাস আর কবিপত্র'র ছিলেন প্রায় নিয়মিত লেখক। পঞ্চাশের

গোড়া থেকে তাঁর ছন্দমধুর পরিমিতবাক্ কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছিলো, আর ধীরে ধীরে নিজস্ব বিশিষ্টতা লক্ষণীয় হয়ে উঠছিলো। ভিন্ন প্রবন্ধে আমি তাঁর কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, 'অনন্যসাধারণ বাক্‌ভংগি, শব্দগ্রন্থন-পটুতা, নিরাসক্ত দৃষ্টি, বিষয়ীর চেয়ে বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েও ব্যক্তিগত উচ্চারণ, এসব নিয়ে প্রথম থেকেই অলোকরঞ্জন প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন।' সত্যি বলতে কি পঞ্চাশের কবিরা, আমরাও দীর্ঘকাল এই কবির দিকে দৃষ্টি মেলে বসেছিলাম; বিষয়ের অভিনবতা ও চারুতা, কথনকলার অনন্যতা অলোকরঞ্জনকে প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলো, তাঁর সম্বন্ধে ঔৎসুক্য ছিলো সমসময়ে জীবিত সকল কবির। আমি ছিলাম অন্ধ, প্রশ্নহীন ছিলো আনুগত্য, একুশ বছর বয়সের উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ—শ্রদ্ধা জানিয়েছিলো 'সনেট' গ্রন্থ উৎসর্গ কোরে অনতি-তিরিশের কবিকে।

আর এই একই মনোভংগি থেকে প্রস্থান শঙ্খ ঘোষের; 'দিনগুলি রাতগুলি'র কবি বলে তাঁর পরিচয় তখন; সমসময়—যা অলোকরঞ্জনে কোনোভাবেই প্রশ্রয় পায়নি, শঙ্খ ঘোষের প্রথম গ্রন্থে তা পরিবেশ কিংবা আবহ রচনা করেছিলো; যতদূর মনে পড়ছে, সামান্য বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ইংগিত বাজিয়ে দিতেন তিনি, আর অলোকরঞ্জনের ঈশ্বরীয় আস্তিক্য শঙ্খে এসে মানবীয় প্রাকৃতিকতা পাচ্ছিলো।

পঞ্চাশের কবিতার যে উচ্চরোল উচ্চারণ আমরা তার চরিত্র বলেই জেনেছি, শঙ্খের তা কখনোই ছিলো না। প্রবন্ধান্তরে বলেছিলাম :

> 'খুবই শান্ত, অনেকটা স্বগতোক্তির ভংগিতে শঙ্খ ঘোষ কবিতায় কথা বলেন, প্রচ্ছন্নভাবে সমকালীনতা গ্রথিত থাকে অন্তর্সূত্রে, গভীর আবেগে বেজে চলে উচ্চারণ :
>
> এই সেই অনেক দিনের ঘর, তার দেয়াল ফাটছে, আশা ফাটছে।
> যেদিকে তাকাই তার নির্বোধ নীরব চোখ,
> ভীষণ লজ্জাহীন একঘেয়ে সূর্যহীন গন্ধ
> বৎসরের পর বৎসর একখানি টালি খসিয়ে মাথা তুলেছে।'

দিনগুলি রাতগুলি পর্যায়ের উদ্ধৃত পংক্তি, অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির সমন্বয়ে উজ্জ্বল রক্তাক্ত; মমতাময় স্বদেশ, রিরংসামত্ত পৃথিবী, কেন্দ্রে প্রখর দৃষ্টি মেলে কবির আত্মপ্রশ্ন, দ্বন্দ্ব আর সমাধানের আশায় উদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে শঙ্খ ব্যাপ্ত পৃথিবীতে নিজের খণ্ড সত্তাকে ছড়িয়ে দেবার প্রার্থনা করেছিলেন—'।

'আলোকিত সমন্বয়ে'র বাক্‌রীতির নতুনত্ব আমাদের চমকে দিয়েছিলো। 'সমস্ত ঘর জানলা হয়ে তোমার দিকে চেয়ে আছে'—এখনো স্মৃতিতে বেঁচে আছে। পয়ারের প্রলম্বিত চাল যদিও বাংলা কবিতার প্রাণ; মাত্রার সমত্ব রেখে সম অসম পংক্তি সাজিয়ে বলাকায় যে অবাধ অনুভবের সঞ্চরণ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, পরবর্তী কবিদের হাতে তাঁর বিস্ময়কর সম্ভাবনার নানা দরজা খুলে দেবার কঠিন শ্রম আমরা দেখেছি; আলোক সরকার সেখানে সংগীত ধর্মকে শব্দের মাঝখানে চালিয়ে দিয়ে ধ্বনির প্রাধান্যকে কানের কাছে প্রকাশ্য কোরে তুললেন। খুবই শান্ত, নিস্তরঙ্গ বিশুদ্ধ আন্তরিক আবেগের কবি আলোক সরকার; আধুনিকদের প্রশ্নমনস্কতা, অশুভ-ইংগিত আর দ্বন্দ্বরক্তিমতা তাঁর কবিতার প্রশ্রয় পায়নি; প্রকৃতি আর ব্যক্তিগত অনুভূতি, ব্যক্তিগত প্রেমচিন্তা তাকে সমসাময়িকদের জটিল জগতের থেকে ভিন্ন জগতে স্থাপন করেছে। তাই হয়তো, তাঁর কবিতায় সমসময়ের ক্ষাত্র বেদনার চেয়ে ব্রাহ্মণ্য বিষাদ প্রাধান্য পায়; সব সময়ে তিনি আত্মরক্ষার তাগিদে নিজেকে ঘিরে বিশুদ্ধ বেদনার বর্ম নির্মাণ কোরে চলেন। পঞ্চাশের এই বিরল ব্যক্তিতন্ময় কবি আজকের কবিতার সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বলয় পরিক্রমায় সম্মানিত ব্যক্তিত্ব।

এই একই প্রশাখায় দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নীলাম্বরী' নিয়ে উপস্থিত হলেন, সম্ভবত প্রথম বই, আর ক্রমাগত বদলাতে লাগলেন তিনি। বিশুদ্ধতা বস্তুত কি, তা দেবীপ্রসাদের কবিতা পাঠে ধরা পড়ে। ছন্দ-নৈপুণ্য, অতি মসৃণ কমনীয় শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা দেবীপ্রসাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট; অন্যদিকে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত শুদ্ধ পয়ারে স্বাভাবিক কথাকে কবিতা কোরে তোলেন।

স্বভাব-স্বচ্ছল পংক্তি গঠনে সমরেন্দ্রর যেমন স্বাভাবিক দক্ষতা; তেমনি সমকালীন বিষয়, এবং নিজস্ব অবস্থানগত উপলব্ধি তিনি বুঝে নিতে পারেন!

কে যে এই মানবিক স্পন্দনের সব প্রশ্ন একা ছুঁতে পারে!

পাস্তেরনাক মারা গেলেন, কারা যেন খুব কুয়াশায়
শবাধার কাঁধে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে পৃথিবীর শুদ্ধতম বিশ্বাসের দিকে
কোন কোন বুক থেকে দুঃখ বড় শব্দ করে আর্তনাদ করে।

শেষ পর্যন্ত কবিকে ফিরে আসতে হবে কবিতারই কাছে; যে কোন statement-ও কবিতা হতে পারে, যদি তার প্রকাশের পেছনে থাকে উপলব্ধির চাপ;

সমরেন্দ্র শেষ পঞ্চাশে লিখতে শুরু করেন, আর ইতিমধ্যে উৎপলকুমার বসু, কিছু আগের আনন্দ বাগচী, যুগান্তর চক্রবর্তী, সমকালীন মোহিত চট্টোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী, তারাপদ রায়, স্বদেশরঞ্জন দত্ত, শান্তি লাহিড়ী পত্রপত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করছেন। উৎপলের 'চৈত্রে রচিত কবিতা,' মোহিতের 'গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' যথেষ্ট আলোচিত হয়েছিলো। এই সময়েই বাংলা কবিতার রিপোর্টাজধর্মী রচনারীতি লক্ষণীয় হযে উঠতে শুরু করে। কিছু আগের অরবিন্দ গুহর স্মার্ট আর ব্যঙ্গাত্মক প্রেমের কবিতায় এই একমাত্রিকতা (one dimension) উপভোগ্য ছিলো। 'ভালোবেসেছিলাম স্বৈরিণীকে / খরচ করে চৌদ্দ সিকে।' —এরকম পংক্তি মুখে মুখে ফিরতে থাকে। আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'একা এবং কয়েকজন'-এর গৈরিক কাপড়ের মলাটের নিচে যে সরল, সহজপাচ্য রিপোর্টাজ ধরনের রচনারীতি আর স্মার্ট, নাগরিক যুবকদের স্পষ্ট ভাষণ প্রথম আবিষ্কার করলাম, মনে পড়ে—তা সুখকর অভিজ্ঞতা বলে মনে হয়েছিলো। 'উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উনতিরিশে এসে গর্ভবতী হলো।' —একমাত্রিক স্তরহীন পদ্যের চমৎকার উদাহরণ। সুনীলের 'দাঁতের ব্যথায় ভুগছেন একজন দার্শনিক' জাতীয় স্মার্ট লঘু-কবিতা স্বীকার করতেই হবে—বাংলা কবিতার অনুশীলনধর্মী বৈদগ্ধকে অস্বীকার কোরে সোজাসুজি আবেদন নিয়ে এসেছিলো ; সুতরাং এরকম রচনা, আমাদেব যুবকচিত্তে সাড়া জাগাতে সক্ষম হলো।

তারাপদ বায়ের প্রথম কবিতার বই বাংলাদেশেব লোকজীবনেব সহজগ্রাহ্য রূপ গভীর আন্তরিকতায় স্পর্শ করেছিলো, পরবর্তীকালে তাবাপদ ভাষণধর্মী ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় নিজের চরিত্র নির্মাণ করলেন, আর বিনয় ব্যর্থ প্রেম বিষয় হিসেবে গ্রহণ কোবে চতুর্দশপদী বা টানা পয়ারে জীবনানন্দীয় আবহ স্বীকার কোরে সহজ আবেদনের সৃষ্টিতে গা ভাসালেন। কবিতার আর একটি মাত্রা যুক্ত হলো অবশেষে—ব্যঞ্জনা নয়, ইংগিতের চেয়ে উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে সরাসরি স্পষ্ট কোরে তোলার,—পঞ্চাশের কবিতার প্রধান আয়োজন এই স্পষ্টতায় ; সুভাষের কথ্য রীতির মধ্যে এই আলাপচারিতার (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ) বীজ ছিল, তা আরো প্রতিদিনের স্পর্শে ঝকঝকে চমৎকার শরীর নিলো পঞ্চাশের সুনীল, তারাপদ ইত্যাদির কবিতায়। রিপোর্টাজ গদ্যের চালে কবিতা, নিরাবৃত অকুণ্ঠ উচ্চারণের কবিতা প্রধানত সুনীলের মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠলো। কবিতা চিন্তার বা উপলব্ধির স্তরে পৌঁছোনোর দায়িত্ব পরিহার কোরে চলে এলো একমাত্রিক

লক্ষ্যভেদে; আর ব্যঙ্গ, স্মার্টনেস, যুবকোচিত অস্থিরমনস্কতা লক্ষ্য কোরে, অর্থাৎ কবিতা লেখার সহজ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়ে যাওয়ার সর্টকাট পথ ধরে একদল তরুণ এলো অনুসারী হয়ে ; আত্মবিসর্জন আত্মবিলোপেরই পথ রচনা করছে, এরা তা বুঝে উঠতেই পারলো না। ফলত প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মিললো হাতে হাতে ; খ্যাতিও জুটলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়, তার জন্য যা আজীবন দিতে হয়, তা দিতে হলো না মোটেই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতার মূল কেন্দ্র স্পর্শ করেই, অর্থাৎ কবিতাকে কবিতাই হতে হবে প্রথম—তা স্মরণে রেখে পয়ারে, মাত্রাবৃত্তে যখন যেমন খুশী লিখতে শুরু করলেন। ফলত, কিছু দেশজ শব্দ, এলোপাথারি শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে একান্তই ব্যক্তিকে অর্থাৎ নিজেকেই বিষয় কোরে সংখ্যাহীন পদ্য রচনায় সোরগোল তুললেন। শক্তি কখনোই স্থৈর্য আয়ত্ত করেন নি, এসে যায় না কিছু তাতে, সহজ কথা সহজ ছন্দের মাত্রায় আবদ্ধ রেখে স্বভাবোক্তির স্বাভাবিক প্রকাশে ভালো কবিতা লিখতে লাগলেন। অমিতাভ দাশগুপ্ত অবশ্য শেষ-ষাটের দিনগুলিতে স্পষ্ট হতে লাগলেন. তাঁর নিজস্ব ভূমি পেতে সময় নিলো অনেকটা। অমিতাভ'র স্মার্ট কথন-ভংগির সঙ্গে জার্নালিজমের মিশ্রণ লক্ষ্য করার বিষয়, যদিও এর সঙ্গে সাম্যবাদের সূক্ষ্ম দার্শনিকতার শৈল্পিক সংযোগ ঘটালেন। তরুণ সান্যালও এরকম প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, তাঁর কবিতায় উচ্চরোল প্রগতিয়ানা ছিলোনা, অবশ্য সুভাষের সিদ্ধির পর ঐ পথে কিছু সংযোজন বেশ কঠিন—তা উপলব্ধি করতে সময় লাগেনি এঁদের, এ কারণেই নৈর্ব্যক্তিকতার পথ পরিত্যাগ কোরে সমসময়ে নিজেকে স্থাপন কোরে রাখতে চেয়েছিলেন। এ পথে তুষার চট্টোপাধ্যায় বা যুগান্তর চক্রবর্তী কিছুটা পথ পরিক্রমা অন্তে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বয়সে পঞ্চাশের কবিদের সমবয়সী হয়েও, সাম্প্রতিক কালে বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন স্নেহাকর ভট্টাচায! ময়ূখ সম্পাদনা কালে তাঁর কবিতা নিজস্ব কথন-কলা আবিষ্কারের চেষ্টা কোরে চলছিলো, তারপর দীর্ঘ এক দশকের নীরবতা। 'তৃষ্ণার তমসা' নিয়ে ক্রমশ পরিণত। কবিচরিত্র স্নেহাকরের সবার থেকে আলাদা, অথচ ঐতিহ্যগত যোগসূত্র রক্ষায় অবিচল একটি নিজস্ব ভূমির সন্ধান দিলেন। নাগরিক যন্ত্রণার তীব্র বিষ তাঁর কবিতায় তীক্ষ্ণ উপলব্ধি-প্রোথিত শব্দে বেজে উঠলো, তা প্রায় আড়ালে, ফুটে ওঠবার পর অনিবার্য প্রকাশ পেলো প্রকাশ্যে—একটি ব্যক্তিত্ব বোধ ও বেদনায় আপ্লুত, নম্র ও শাণিত উচ্চারণে সরব—আমরা

আকৃষ্ট হলাম তাঁর দিকে।

খুবই অনালোচিত, অথচ স্পষ্ট ব্যক্তিত্বে, চিত্রকল্পের বহুল নির্মাণের নিজস্বতায় স্নেহাকর এসময়ের অতিবিশিষ্ট কবি বলেই আমার মনে হয়েছে।

সত্তার ভিতর দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সৃষ্টি খোলে পরতে পরতে
ঘুমরানো নদীতে দুটো কাক
গলিত শবের পিঠ খুঁটে খেয়ে ভরা পেটে অদ্ভুত আওয়াজে
ভোরের সংবাদ আনে ; দড়িটানা ভিখিরী-শকটে উবু হয়ে
খঞ্জের মতন সূর্য কর্কশ চেঁচায়—
কলকাতা খানকির মত হাঁটুর উপরে শায়া তুলে
উঠে বসে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।

এরকম স্পষ্ট আর নীলিমাভেদী উপলব্ধি স্নেহাকর ভট্টাচার্যের কবিতায় নিজস্ব পরিমণ্ডল রচনা করে, আর তিনি অনালোচিত হয়েও আমার কাছে অনিবার্য কবিসত্তায় চিহ্নিত হয়ে পড়েন।

ভুলে গেছি দিলীপকুমার সেনকে ; পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে অন্যতম শক্তিমান 'উত্তর তরঙ্গের নায়ক' দিলীপ সেন আজ আমাদের স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে আছেন—তা শুধু তাঁর কবিতারই জন্য। সমস্ত ডামাডোল থেকে দূরে নিজস্ব একটি মৃত্যু-চেতনার পুরাণকল্প বিশ্ব নির্মাণ কোরে অতি সংহত কলাকৌশলের সিদ্ধি আয়ত্ত কোরে নির্বাসন চেয়েছিলেন। মৃত্যু এসে তাঁর প্রার্থিত নির্বাসন এনে দিলো। হয়তো তাঁর আত্মহত্যা কবিতার সত্যকে চেখে দেখবারই জন্যে। তিনি যে কতোটা গভীর বেদনা-বিহ্বলতার কবি, তরুণ কবিদের আত্মবীক্ষণের জন্যই তা বুঝে নেওয়া দরকার।

আরো কতকাল—এভাবে কলম ঠেলতে বলো, / আরো কত কাল সন্ধ্যা সকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো ? —লেখা যে কলম ঠেলা আর লেখা লেখা খেলা নয়, তা যে জীবনের, সামগ্রিক অস্তিত্বের শিকড় শুদ্ধ উপ্‌ড়ে আনার বিরামহীন আপ্রাণ প্রয়াস-প্রতিভা, পঞ্চাশের কবিদের অনেকেরই এই উপলব্ধি ঘটেছিলো, তাই শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অস্তিত্ব-জাত সমস্যা তীব্র রক্তাক্ত সংবেদনায় বেজে উঠতে দেখলাম। শঙ্কর দার্শনিক অনুভূতির সূক্ষ্ম নৈঃশব্দে যেতে চেয়েছেন, নিজের বস্তুগত জীবনতার উৎস ও পরিণতি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত পঞ্চাশের প্রথম সারির কবি ; অবশ্য তাঁর পরিণতি খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শান্ত সমাহিত তাঁর চরিত্র,

বলার নিজস্ব স্টাইল নিচু স্বরের; মাঝে মাঝেই মনে হয়, কানে কানে কথা বলছেন প্রণবেন্দু। ব্যক্তিগত ক্ষোভ দুঃখও যেনো বড়ো দার্শনিকতার উপলব্ধিতে মেলাতে চান, ফলত অনেক সময় আমার কাছে দূরের মানুষ থেকে যান। মানুষের দিকে তাঁর অগ্রসরণ ইদানিং লক্ষণীয় কোরে তুলছে ক্রমশ। শান্তিকুমার ঘোষ ছোট ছোট চিত্রপ্রতিমা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে অনুভূতিকে শরীরী কোরে তোলেন। অত্যন্ত মিতবাক্ তিনি, অত্যন্ত সচেতন তাঁর শব্দব্যবহার; মাঝে মাঝে শব্দের বিন্যাসের মধ্যে নৈঃশব্দ-মণ্ডল রচনা করেন। এ এক পদ্ধতি। ভালো লাগার মতন কবিতা দেখেছি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের। আর ধুলিমুঠি সোনার ফণিভূষণ দেড়যুগ পরে ফিরে এলেন গদ্য-ভংগির কথ্য চালটি আয়ত্ত কোরে।

পঞ্চাশের ত্রিমুখী চারিত্র্য অর্জনের সময় ষাটের শুরুতে, হয়তো একারণে, স্পষ্টই মনে আছে, আমাদের তারুণ্য গ্রস্ত হলো বিষণ্ণতায়, বিমূঢ় অবস্থায় ভাবা শুরু করলাম, চতুর্থ কোনো মাত্রা আবিষ্কার যা না হলে আত্ম-বিলোপই পরিণতি হবে অচিরে; তাই ভাবতে হলো কিভাবে আত্মরক্ষা করা চলে। সম্ভবত বাংলা ভাষায় একটি মাত্র দশকের পরিসরে অনেকগুলি আন্দোলনের উদ্ভব এ কারণেই। হাংরি জেনারেশন, ধ্বংসকালীন, এই দশক, শ্রুতি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পথ খননের দুরূহ প্রচেষ্টা এই সামান্য দশবছরের সময় পরিসরে বৃদ্ধি পেলো। কম্যুনিস্ট আন্দোলনের তুঙ্গ সময়, কম্যুনিস্ট দুনিয়াব মধ্যে ভাঙন, মূল্য বৃদ্ধি, যুক্তফ্রণ্টের সার্বিক সাফল্যের স্বপ্ন—নানামুখিন চূড়ান্ত রাজনীতিক সামাজিক টানাপোড়েনে এ দশক আন্দোলিত হয়েছে, তাই পঞ্চাশের মতন যূথবদ্ধতা এসময়ে দানা বাঁধতে পারেনি, বরং সন্দেহ, সংশয়, বিদ্বেষ, উচ্চাশা, নৈরাশ্য প্রভৃতি বিপরীতমুখিন টানাপোড়েনে এসময়ের তরুণ সাহিত্যকর্মীর অস্থিরতা বেড়েছে; কোথাও বিশ্বাস, মানবিকতায়ই হোক আর প্রেমেই হোক, দেখা যায় নি। হাংরি জেনারেশনের সুভাষ শৈলেশ্বর মলয় ইত্যাদি বুর্জোয়া সমাজের সর্বাতিশায়ী অবক্ষয়ের মধ্যে মধ্যবিত্তের অবস্থানের প্রকৃত স্বরূপ তুলে দেখাতে চেয়েছেন, আর কোনো বিশ্বাসই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য নয়, এরকম একটি সিদ্ধান্তে তাঁরা যৌথ ভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। ৬১/৬৫-র কলকাতায় গিন্‌স্‌বার্গের উপস্থিতি, তাঁর কবিতার প্রভাব পঞ্চাশের কোনো কোনো কবির উপর যথেষ্টই পড়েছিলো, আর হাংরি লেখকদের তাবৎ বিপরীতমুখী সাহিত্য ভাবনার উৎস খুঁজতেও সেখানেই যেতে হবে। ধ্বংসকালীন আন্দোলনের

মূলেও হয়তো ছিলো অস্তিত্বের সামগ্রিক চেহারাটি বিশ্লেষণ করার, উপলব্ধি করার আন্তরিক তাগিদ। লেখা যে লেখা লেখা খেলা নয়, কলম ঠেলার মতন আভ্যাসিক শব্দচর্চা নয়, তা বুঝে নিয়ে, ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান—বুর্জোয়া সমাজের স্বরূপ, দায়বদ্ধ মানুষের নৈরাশ্য—বহুমুখিন দায়িত্ব সম্পর্কে স্বীকৃতি—ইত্যাদি ভাবনা আমাদের তাড়িত কোরে নিয়ে যাচ্ছিল অনিশ্চয়তার দিকে। আমাদের কবিতা থেকে রম্য শব্দ গীতল উপমা ক্রমশই বিলুপ্ত হচ্ছিল। আর এই দশক বা শ্রুতি ঘোষণা করলো শব্দই কবিতা, তা কিছু বলার জন্য দায়বদ্ধ নয়। পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডলের কবিতা ক্রমশ শব্দের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য বর্জনে হয়ে উঠেছিলো উন্মুখ। গল্প এবং কবিতা—উভয়ত এঁরা শাস্ত্র বিরোধী হতে হতে নিজেরাই আভ্যাসিক শাস্ত্রে জড়িয়ে পডলেন। তথাপি চল্লিশের সামাজিক দায়দায়িত্ব বিষয়ে সচেতনতা, দেশীয় জীবনের শিকড় সন্ধান যেমন বাংলা কবিতায় নতুন ঐতিহ্যের সূত্রপাত করলো সুভাষ, দিনেশ, মঙ্গলাচরণ, রাম বসু ইত্যাদির কবিতার মধ্য দিয়ে; তেমনি সূক্ষ্ম সংবেদনা, সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তিক নৈঃসঙ্গের অবস্থানগত ভূমি বুঝে নেবার নতুন চেতনা শঙ্খ, অলোক-রঞ্জন সুনীলের রচনায় আর একটি মাত্রা যোজনা করলো; আর তৃতীয় ঐতিহ্যের শুরু স্মার্ট, গল্পচ্ছলে কোনো একটা অভিজ্ঞতা সরাসরি প্রকাশের রিপোর্টাজ পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এগুলো আমাদের, যারা ষাট দশকে এলাম, খুব কাছাকাছি থেকে বুঝে নিলাম; সর্বোপরি জীবনানন্দের অন্তঃশীল প্রভাব এড়ানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। এইসব টানাপোড়েনের মধ্যে বুঝে নিয়েছিলাম কেউ কেউ, নতুন কোনো পথ খুঁজে নিতেই হবে। এই 'স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা রত্নেশ্বরের কিংবা আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থে নেই, তা অনেকটাই গতানুগতিক, বিভ্রান্ত অবস্থার রচনা। খুব দ্রুত সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি। এটা খুবই কঠিন; তাই এপথ-ওপথ ঘুরতে হয়েছে বেশ কিছুদিন। অবশেষে নিরন্তর সন্ধানের, অতৃপ্তির মধ্য দিয়েই দীর্ঘ কবিতার নতুন পদ্ধতি শবযাত্রায় আবিষ্কৃত হলো, স্বীকৃত হলো তার প্রকরণগত বিশিষ্টতা আর চেতনা প্রবাহের রীতি প্রয়োগের আপাত সাফল্য। কিছু পরে রত্নেশ্বর লোকায়ত অলৌকিক, পরে পুষ্কর শব্দ শব্দ গ্রন্থে ভিন্ন ভূমি খুঁজে পেলেন।

তখন উনষাট, ষাট সাল। ৬০ নম্বর সদানন্দ রোডে থাকি, কবিপত্র আর্থিক দুরবস্থার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে, তথাপি ৬০ সদানন্দে এই দশকের তাবৎ কবি-গল্পকারের ভিড সকাল সন্ধ্যা, ছুটির দিনে ঘরে স্থান সঙ্কুলান হয় না। সবার

মধ্যে নতুন লেখার তাগিদ। বিমল করের নতুন রীতির গল্প আন্দোলন চলছে ; আশিস ঘোষ, রমানাথ রায় বিদিশা নামের গল্প-পত্র প্রকাশ করেছেন, হাংরিদের আন্দোলনও চলছে উত্তেজনার মধ্যে। ৬০ নম্বর সদানন্দ থেকে ষাটের গল্প লেখকরা খুঁজে পেলেন সময় চিহ্নিত 'এই দশক' নামটি। বিদিশা রূপান্তরিত হলো 'এই দশক' এ। এলেন কালো লম্বা ছিপছিপে দারিদ্রতাড়িত কালীকৃষ্ণ গুহ, তখনো লেখা নিজস্বতা পায়নি,—অনেকটাই মুগ্ধ বিস্ময় চোখে নিয়ে, 'শবযাত্রা' তাকে আবিষ্ট করেছিলো—মনে আছে ; ফর্সা লম্বা সুদর্শন মৃণাল বসুচৌধুরী, বেটে খাটো গ্রামীণ সারল্যমাখা পরেশ মণ্ডল, গল্পকার অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বভাবী উচ্চাশাপ্রবণ সুব্রত সেনগুপ্ত, আলাপে ব্যঙ্গ নিপুণ, নতুন কিছু করার উদ্যমে সচেতন রমানাথ রায় ; নিঃসঙ্গী, সবার বন্ধু আশিষ ঘোষ, রুগ্ন শরীরী কল্যাণ সেন ; গল্পকারদের উদ্যম তখন কবিদের ঈর্ষিত কোরে তুলছে। কিছুদিন পর রোগা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রভাত চৌধুরী, অশোক দত্ত চৌধুরী—অর্থাৎ ৬০ সদানন্দে তখন দশকের তাবৎ লেখক হয়েছেন মিলিত। কম্যুনিষ্ট কর্মী, ঝকঝকে স্মার্ট গণেশ বসু রয়েছেন, প্রকাশ করছেন একের পর একটি বই। আর, বিষয় বা ভংগি—আমাদের সঙ্গে পার্থক্য তেমন ছিলোনা, তবে চড়া সুরের লেখক ছিলেন গণেশ প্রথম থেকেই। আশিস সান্যাল আমাদের সকলের চাইতে বিচ্ছিন্ন থেকেই লিখছেন, শান্তনু দাস কবিতা লিখছেন, এটা আমাদের জানা ছিলো না। আমাদের গোটা দশকই বিপরীতমুখী রাজনৈতিক আবর্তে টালমাটাল ছিলো, লেখাতেও নানা স্রোতের টানা পোড়েন ; ফলত মধ্যষাট নাগাদ শিবির গেলো ভেঙ্গে, ছড়িয়ে পড়লাম সবাই ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে, গোষ্ঠী সাহিত্যের পত্তন হলো ; স্বীকার, অস্বীকৃতির পালা চললো, মতবাদের উচ্চকিত কোলাহল ; নিজ নিজ মতকে আঁকড়ে থাকার প্রাণান্ত সাধনা। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সবকটি দলই ছিলো বিদ্রোহী, প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নানা ঘোষণায় সরব ; আর প্রতিষ্ঠানের বিশাল ছায়ায়, সমর্থনে তুষার রায় কিংবদন্তী হতে লাগলেন ; প্রকাশিত হতে লাগলো ক্ষুদে পত্রিকা সংখ্যাহীন। কবিপত্র আবার বেরুলো, এই দশক চলছে, মাঝে মাঝে শ্রুতির দু'একটি সংখ্যা।

পঞ্চাশ দশকের কবিতার চরিত্র থেকে ষাট দশকের চরিত্র সব অর্থেই আলাদা, আর তা না হয়েও উপায় নেই ; ষাটের শুরুতে অনুকরণ ছিলো না তা নয়, খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের কথনভংগি ও সময়োপযোগী অস্তিত্বগত

সমস্যাটা বুঝে নেবার জরুরী মানসিকতার জগৎটি আমরা বুঝে নিয়েছিলাম। প্রশ্ন উঠতে পারে, এভাবে দশক ভাগ সাহিত্যের পক্ষে জরুরী কিনা, কিংবা কিভাবে এরকম একটি সীমাশ্রয় মেনে নেওয়া হয়ে থাকে। এই দশক বিভাগ মাত্রই আলোচনার সুবিধের জন্য, এতে সূক্ষ্ম চেতনার স্পষ্ট একটি ভেদরেখা ধরা পড়ে, কেননা রাজনীতিক ও সামাজিক উভয়তই কিছু কিছু পরিবর্তনের নিজস্বতা দশকের অন্তর্বর্তী সময়ে পেয়ে যেতে দেখি। এক সময়ে একদল তরুণের প্রথম উপস্থিতির পিছনে হয়তো সময়ের চাপ থেকে যায়, তাই একই অর্থনীতিক, সামাজিক পরিবেশের মধ্যে থেকেও তাদের নিজ নিজ দেখার সমানধর্ম এবং বৈপরীত্য স্পষ্ট হতে থাকে ; আলোচনার সুবিধের জন্যই এই দশকের সীমানা মেনে চলার রীতি গড়ে উঠেছে হয়তো।

আমাদের দশকের শুরুতে সমবয়সীদের বাস্তব সমস্যা খুবই কঠিন সংকটের মধ্যে পড়েছিলো ; আমরা জীবনযাপনের উপযোগী শর্তগুলি আয়ত্ত করতে খুবই বিড়ম্বিত এবং বিপর্যস্ত অনুভব করছিলাম। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি খণ্ড খণ্ড ভাবনার চেয়ে উপলব্ধির বিমিশ্র প্রবাহের দ্বারস্থ হবার আন্তরিক তাগিদ উপলব্ধি করছিলাম। একক ও বহু জীবনের ইউনিটগুলি মূলত বিচ্ছিন্ন হয়েও একটিই স্রোতের অনুকূলে প্রতিকূলে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে পরিণতি পাচ্ছে, অতএব খণ্ড কবিতার চেয়ে দীর্ঘতার সূত্রে অনুভূতির পারম্পর্যকে বেঁধে দেবার সময় এসেছে,—এমত তাগিদ থেকে শবযাত্রা কিংবা ইবলিসের আত্মদর্শনের রচনা শৈলীর প্রবর্তন ঘটলো। রত্নেশ্বর অন্য পথে—অনেকটাই কামিংস-এর শৈলী আয়ত্ত কোরে ব্যক্তিগত উচ্চারণের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। সমাজজড়িত ক্ষতদুষ্টতার হাহাকার নয়, প্রকৃতি প্রেম বা ব্যক্তিগত স্বপ্ন কল্পনা এমত সব বিষয় নিয়ে উচ্চারণকে ভেঙে দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধতার দিকে পৌঁছোতে চাইলেন, আর কালীকৃষ্ণ বুদ্ধদেব বসুর 'শুধু তাই পবিত্র যা ব্যক্তিগত' উচ্চারণকে, নিজের মতন কোরে স্বীকৃতি জানালেন। মৃণাল বসুচৌধুরী মুহূর্তের মুডকে অনন্য চিত্রকল্পে ধরে রাখার প্রয়াস করলেন। খুব সংযত আর ইংগিতময় কবিতার দৃষ্টান্ত মৃণালের কবিতা। খুবই নীচু স্বরে, হেমন্তের ধূসরতার, শীতের কুয়াশাজর্জর হিম পৃথিবীর মধ্যে একা হাঁটতে হাঁটতে স্বগতোক্তি করলেন, অস্বীকার কোরে তাবৎ বস্তু জগতের দ্বন্দ্বরক্তিম সমস্যার চাপ, যা জীবিত জনের উপর কোনো না কোনোভাবে শীতল চীৎকারের জন্ম দেয়। মৃণাল দত্ত অভিজ্ঞতাকে তেমন মূল্য না দিয়ে মুহূর্তের অনুভূতিকে নিজস্ব ঢঙের বাচনিক

রীতিতে প্রকাশ করতে লাগলেন, ছন্দ আর শব্দ গ্রহণে সাফল্য আয়ত্ত থাকা সত্ত্বেও খুবই অল্প লেখার জন্য নেপথ্যে রইলেন তিনি। গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বয়সে ষাটের অগ্রজতুল্য, তবু তিনি এসময়ে মৃদু স্বগত উচ্চারণে ব্যক্তিগত শরক্ষেপে চিরকালীন মানবীয় অনুভূতিকে অবলম্বন কোরে সংক্ষিপ্ত সংগীতধর্মী কবিতা লিখেছেন। ষাটদশকের মাঝামাঝি অনন্ত দাশ সামাজিক দায় ও ব্যক্তির ভূমিকা সম্বন্ধে দায়িত্ববান থেকে কবিতা লিখতে শুরু করলেন। অনন্তর কবিতা কবিত্বপূর্ণ, চিত্রকল্পপ্রধান। বুদ্ধির ব্যবহার নয়, অনুভূতির সারাৎসার অনন্তর কবিতার চরিত্র। কবিরুল ইসলামের কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক পরে। কবিরুল শান্ত, অনুভূতির সংবেদনায় ওঁর কবিতা গভীর তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠে। প্রায় সমবয়সী সামসুল হক; পঞ্চাশের শেষ দিকের কবি, চরিত্র পেয়েছেন ষাটের দশকে এসে। ছন্দে নিখুঁত হাত সামসুলের, আর লিখতেও পারেন প্রচুর। কিছুটা গুহ্য-মন্ত্রের চরিত্র রয়েছে সামসুলের কবিতায়, তাই ইংগিত বেশি, বলেন কম। খুবই ব্যক্তিগত সামসুলের কবিতা।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র প্রথম কবিতার বই 'গভীর এরিয়েলে' কবিপত্র থেকেই বেরিয়েছিলো। জীবনানন্দীয় জগৎ সেই সব কবিতায় ছায়া ফেললেও নিজস্ব বাচনভংগি বুদ্ধদেবের, সেখানেই ধরা পড়েছিলো। বুদ্ধদেব পরবর্তী কালে বিষয় ও বাক্‌ভংগি নিয়ে স্পষ্ট হতে থাকেন, ক্ষমতারও পরিচয় দিতে থাকেন।

আর ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা পরিচিত সংসারের চিত্রকল্পময়। সহজ বলার ভংগি তাঁর আয়ত্ত, এরকম দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়েরও, গদ্যের চালে জরুরী কথাগুলো বলে যান; চিন্তার ভার এঁরা কবিতায় সহ্য করেন না। সুব্রত চক্রবর্তী ভালো কবিতা লিখতেন, ছন্দের হাত দক্ষ, তবে লেখাতে কোনো ঝুঁকি ছিলো না। অর্থাৎ নতুন ভাবে বলার চেষ্টা ছিলো না।

অশোক চট্টোপাধ্যায় নিজেকে ভাঙছেন; এক জায়গায় থেমে যান নি; খুবই অতৃপ্ত। প্রথম ষাটে কিছু লেখার পরে কেনো যে স্তব্ধ হয়ে গেলেন! পরে আবার সক্রিয়; চিন্ময় গুহঠাকুরতা বা করুণাসিন্ধু দে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েও কবিতার জগৎ থেকে সরে গেলেন।

শংকর দে-র স্বপ্নের মধ্যে চিৎপুর ফায়ার এলার্ম একসময় খ্যাতি কুড়িয়েছিলো। তারপর দীর্ঘদিন শংকর অন্তরালে। ইদানিং মন্ত্রঘন কবিতা নিয়ে শংকর উপস্থিত। মাঝে মাঝে চমকে দেবার মতন পংক্তি এখনো শংকর লিখে ফেলেন। রবীন সুর ষাটের মাঝামাঝি ছন্দ-দক্ষ কবিতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ওঁর কবিতায় সামাজিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব আছে। একটা গভীর দর্শন আছে ; আবার তুলসী মুখোপাধ্যায় একই সামাজিক ভাবনায় আস্থাশীল হয়েও রিপোর্টাজধর্মিতায় কবিতার চরিত্র ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দিতে ভালো-বাসেন। শম্ভু রক্ষিত ভাষাগত মৌলিকতা নিয়ে আসেন প্রথম থেকেই ; বক্তব্য খুবই অস্পষ্ট, এমন কি ইংগিতও ধরা পড়ে না মাঝে মাঝে ; তবু নিজস্ব চরিত্রে অবিচল। বিজয়া মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিগত অনুভবকে গাঢ় মন্ত্রের চরিত্রে সংহতিতে বাঁধেন, দেবারতি মিত্র চিত্রকল্পের বহুলতায় কবিতাকে জটিল শাসনে রুদ্ধ করেন।

প্রভাত চৌধুরী সময়ের সমস্ত বিষ আত্মসাৎ কোরে নেবার উগ্র আকাঙ্ক্ষায় নিজেকেই দগ্ধ করতে লাগলেন। বিস্ফোরণে জলন্ত নগরেই তার আত্মা পুড়তে লাগলো। আর এই নিজেকে বিষয় কোরে তোলার প্রচণ্ড তৃষ্ণা তাঁর কবিতার মধ্যে সব সময়েই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। মণিভূষণ ভট্টাচার্য যদিও মধ্য পঞ্চাশের কবি, তবুও ষাটের গোড়ায় তাঁর ব্যঙ্গাত্মক আর ঝকঝকে বাচনরীতি যথেষ্ট সচেতন দৃষ্টি দাবি করলো। মধ্যষাটের অরুণাভ দাশগুপ্ত সামাজিক দায়কে স্বীকৃতি জানিয়ে কবিতার শর্তে স্বচ্ছ ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতা লিখলেন, অশোক দত্ত চৌধুরী ও রাণা চট্টোপাধ্যায়—কবিতা লেখার নান্দনিক দক্ষতা এঁরা ধীরে ধীরে খুবই মনস্কতায় আয়ত্ত কোরে উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখলেন এখনো লিখে চলেছেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ঝকঝকে স্মার্ট, যুবকোচিত কথ্যভংগিতে, নিজস্ব বাক্‌রীতি নিয়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠছেন।

ষাট দশকের সাহিত্যের বিভিন্নমুখিন চর্চা পেলো না যৌথভাবে আন্দোলনের রূপ। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা এককভাবে কারো কারো জুটলেও, অধিকাংশ শক্তিমান লেখকই তা পেলেন না; বরং নীরবতার মধ্য দিয়ে উৎসাহ ও উদ্যমকে আড়ালে রাখার হীন ষড়যন্ত্র চললো। তাছাড়া প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতার সংগ্রহ প্রকাশের উদ্যম দেখা গেলো না, ফলে এই প্রতিরোধী দশকের সামগ্রিক চেহারাটা সম্পর্কে পাঠকের পূর্ণাঙ্গ বোধের জন্ম হলো না, হতে সময় নিলো অনেক।

সত্তর দশক এই ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা নিলো, সব দশকই পূর্বতনকে অস্বীকারের মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বী হতে চায়, সত্তরও তাই চাইছে, এটাই স্বাভাবিক। তাতে পূর্বসূরির কিছু মনে করা উচিত হবে না, এটাই নিয়ম। তুষার চৌধুরী, সুব্রত রুদ্র, জয় গোস্বামী অনন্য রায়, অজয় সেন, উজ্জ্বল সিংহ নিজস্ব ভূমির

উপর দাঁড়াচ্ছেন লক্ষণীয় ভাবে। প্রতিভা আর মৌলিকতা মিলতে দেখি এঁদের কবিতায়। পাঁচ বছর পরে নতুন দশক এসে আবার অন্ততন নতুনদের সমালোচনা করবে, পরে পরেও তাই হয়ে চলবে। শেষ পর্যন্ত সব যৌথপ্রকল্প যাবে ভেঙ্গে, শতাব্দীর মিনারে দাঁড়িয়ে হয়তো গুটি কয়েক, প্রায় আঙুলে গোনা যায়—প্রতিভাকে চিহ্নিত করবে 'প্রতিভা' বলে। শেষের সে দিনের ভয়ংকরত্ব নিয়ে এখনই বিমর্ষ হয়ে লাভ নেই। সাধ্যমতন, ক্ষমতানুযায়ী লিখে টিকে থাকবার একক প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে। লেখক বাঁচে না যূথবদ্ধ ভাবে, ওটা পশুদেরই চলে। একা এবং নিঃসঙ্গ মানুষ নিরন্তর সন্ধান করবে মানুষের সঙ্গে বেঁচে থেকে আমার কি লাভ হলো, তাদের সঙ্গে কেমন ভাবে ছিলাম, কি ভেবেছি আমি, কেমন ছিলাম আমরা—আমি—এইভাবে নিজের সঙ্গে গত অনাগত ও সমসময়ের জীবনের যোগসূত্র সন্ধান ও নির্মাণ কোরে যাবেন লেখক—মানুষ হিসেবেই তাই;—যদি এসব করার পরও তাকে বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতেই হয়, তখন তাবৎ অসামর্থতা ক্ষমা পাবে এ জন্য যে এই লেখক তার সন্ধান ও সৃষ্টির কাছে নিবেদিত ছিলো, ক্ষমার অযোগ্য কোনো কাজ সে করেনি, অন্তত সাহিত্যের প্রগতির পক্ষে থেকেছে, অর্থাৎ মানবিকতারও, এ কারণেও সে শ্রদ্ধেয়।

পূর্ব-ভাষ্যে ফিরে আসা যাক। যে মানবীয় প্রকৃতি, তার বহু-ব্যাপ্ত, আকীর্ণ সমস্যা বাংলা কবিতার সূচনা থেকে আদি মধ্যযুগ পার হয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে ভিন্ন বাঁক নিলো, তা মূল্য পেলো, কিংবা সোজা কথায় প্রতিষ্ঠা পেলো আবার জীবনানন্দের কবিতায়। ক্রোধ, ঘৃণা, অস্বস্তি, বিষাদ, যন্ত্রণা, আনন্দ, নৈরাশ্য, দেহজ তাড়না অবশ্য জীবনানন্দে শেষ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ চেতনায় পরিণতি পেয়েছে। ডঃ অমলেন্দু বসুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমিও একমত, যে জীবনানন্দ ক্রমশই প্রশান্তিতে স্থিত হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু Tension এবং Balance of opposites তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে শেষ পর্যন্ত, তাই সজীবতা ও বিস্তৃত অর্থে সমসাময়িকতা তাঁর কবিতায় কেলাসিত রূপ নিচ্ছিলো। বিষ্ণু দের কবিতায় তেমন হতে পারেনি। এই প্রতিভাবান কবি দেশকালের নানা সমস্যায় সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু বাক্‌ভংগি এতটাই অভিনব যে আমাদের সাধারণ জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে তার ব্যবহার খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাছাড়া তিনি অনেক ব্যাপ্ত, দার্শনিক চোখে দেখেছেন সব কিছু, রচনারীতিতে আবেগের শাসন বড়ো

বেশী, কোথায় যেন উপলব্ধি রুদ্ধশ্বাস, আমাদের ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলিকে নাড়া দেয় অনেক দেরীতে। মোহিতলাল জীবনের বস্তুগত তাড়না বুঝেছিলেন, শেষ পর্যন্ত আদিম রিপুগত তাড়নাকেই আধুনিকতা বলে ভাবলেন, আর নজরুল চড়া গলায় আদর্শবাদে বেঁধে দিলেন নিজেকে। আমরা তা চাইনি। আমার রক্ত-ক্ষরণজাত শরীরী উপস্থাপনা চেয়েছি, তা পঞ্চাশের কবিদের কারো কারো মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল—মানুষের অপরিশুদ্ধ অস্তিত্বের উপস্থাপনা। বাছবিচার —এগুলো চলবে, এই নিয়ে লিখবো—ওসব চলবে না, ও নিয়ে লেখার কি আছে—এরকম নির্বাচন চাই না। সব বন্ধ দরজার খিল খুলে দেবার চেষ্টা; মানুষের চেতন ও অবচেতনের উদ্ধার ও বিশ্লেষণ; স্বপ্ন আশা-স্মৃতি-ভবিষ্যৎ; বর্তমানের জটিল গ্রন্থি, নিজের ও প্রতিবেশীর, তাবৎ বিশ্ব-মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক উপলব্ধি। রিপুর তাড়না, অসুখের যন্ত্রণা ও নৈঃসঙ্গ, সবতলার মানুষের সত্তার নিগ্রহ, একীকরণের প্রয়াস—অর্থনীতিক শোষণের পরিণাম, বুর্জোয়া, আধা বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা, মানুষের ক্রোধ, ঘৃণা, পাশবিকতা, মনুষ্যত্ব —তার বিচিত্র প্রকাশ, আমাদের সাহিত্যে এরকম অবাধ ও দায়িত্ববান স্বেচ্ছাচারীদের সংখ্যাহীন অবাঞ্ছিত-প্রবেশ ঘটুক, না হলে আধুনিকতা টেকে না। এখনো এদেশে ললিত-গীতিকলিত কল্লোলের প্রতি সাধারণ রুচির সমর্থন। পৌরুষ দেখলেই আঁতকে ওঠে বাঙালী পাঠক। এটা তাদের দোষ নয়; এভাবেই রুচি গঠন করা হয়েছে; সর্বসংস্কারমুক্ত মানবিকতা মধুসূদনের পর প্রায় পরিত্যক্ত হলো; ব্রাহ্মরুচি আর ভিক্টোরিয় আদর্শবাদ বঙ্কিমের মতন প্রতিভাবানকেও সংস্কারমুক্ত করতে পারেনি। বঙ্কিমও বাঙালীর অত্যধিক গীতি কবিতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন, কারণ হিসেবে ভৌগোলিক অবস্থানের কথা, আমাদের জাতীয় স্বভাবের দোহাই দিয়েছেন; কিন্তু ভুললে চলবে না, এ দেশে লিরিক ধারার পাশাপাশি সবল শক্ত পৌরুষও জ্বলে উঠেছে নানা লেখায় বারবার। আর যদি তা নাও হয়ে থাকে, কেন তাকে ডেকে আনবো না? ধরণীর এক কোণে / বাঁধিব আপন মনে / একটুকু বাসা—/ এরকম মধ্যবিত্ত সুলভ উচ্ছাশা দেখলে আমাদের সস্তা রোমান্টিক মন বাহবা দিয়ে ওঠে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একটি সংস্কারমুক্তির চেষ্টা ছিলো; ষাটের দশকে তা আরো প্রকট হলো। শরীরকে—অস্তিত্বের তাবৎ দাবীকে জীবন্ত কোরে তোলার চেষ্টা এদশকের অন্যতম কৃতিত্ব; হাংরি, ধ্বংসকালীন ইত্যাদি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

তার আত্মপ্রকাশের আয়োজন। যদিও পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী গানের ধারা অক্ষুণ্ণ খাতে বয়ে চলেছে; মধ্য সত্তরে পৌঁছে তরুণতম লেখকদের অনেকেরই লেখায় ইজ্‌ম্‌ বা কুনো-রুচির ছেড়া ন্যাকড়া ঝেড়ে ফেলে রক্তমাংসের মানুষকে বিষয় কোরে তোলার আন্তরিক প্রয়াস স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এখনকার কবিতা থেকে নমনীয় পেলব রম্যতা ক্রমশই বিলুপ্ত হচ্ছে; হয়তো এই পথে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অনুচর্চায় সত্যিকারের মানুষের সাহিত্য রচিত হবে, এ আশা না করলে নৈরাশ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

উত্তর জীবনানন্দ বাংলা কবিতা

দু'ধরনের প্রভাব কবিতায় সংক্রামিত হতে দেখি, প্রতিভার আপাতসহজ কলাকৃতিকে চূড়ান্ত সিদ্ধি মেনে নিয়ে অনুজউত্তরসূরি মুগ্ধ আত্মরতিতে মজে যান ; অন্যদিকে, কোন বিশেষ প্রতিভার সামগ্রিক দানকে উপলব্ধির স্তরে জেনে নিয়ে আপন বাণিজ্যে ব্যবহার করেন ; মূলধন তার নিজেরই, মাত্রই ঐতিহ্যের নতুন সংযোজনকে উৎকর্ষের প্রয়োজনে কাজে লাগানো ; আর তা করেন এমন একটি পদ্ধতিতে যাতে উত্তমর্ণের ঋণ অধমর্ণকে পোঁছে দেয় সফলতার চমৎকার একটি শিখরে, অতি নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে।

সাহিত্যে শিল্পকলায় স্বয়ম্ভূ প্রতিভার জন্ম কতদূর সফলতায় পৌছতে পারে, জানা নেই ; তবে ঐতিহ্যের স্বীকরণ, ব্যবহার পুনর্ব্যবহার বিশেষ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করতে দেখি উত্তীর্ণ শিল্পীমাত্রকেই ; তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী ইতিহাসময় অগণন পিতৃপিতামহের পদচারণার সাফল্য অসাফল্য জ্ঞানে নির্জ্ঞানে তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত ; এরই নাম হয়তো ইতিহাসবোধ, ঐতিহ্য, অন্য অর্থে দেশকাল। একটু বড় অর্থেই। রাজনৈতিক সংযোগ, বিক্ষোভ বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে আবদ্ধ থাকলেও শিল্পের সীমানা সম্প্রসারিত হতে চলেছে সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্তবে স্তরে। আজকে তো আমরা এক অর্থে আন্তর্জাতিক মানুষ, অন্তত হতে চাই ; সংকীর্ণ অর্থে স্বাদেশিকতা নিন্দনীয় বলে মানি। অতএব তাবৎ পৃথিবীর শিল্প-সম্পদ শিল্পেরই সীমানা বাড়ায়, ব্যঞ্জনায় অন্যদিগন্ত স্পর্শ কোরে চলে। আজকে আমাদের শিল্পবোধ নানাদেশকালের সঙ্গে সন্ধি বিগ্রহে আগ্রহী, বিরোধে নয়।

চৈনিক রীতি ব্যবহারে পাউণ্ড লজ্জা পান না, এলিয়ট ভারতীয় পুরাণ-প্রতিমা ব্যবহারেও ; আমাদের জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র শিল্প-ভাবনায় যতোটা নিজের দেশকাল ততোটাই ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে অনুষঙ্গে কবিতার ঐতিহ্যের সীমা-প্রস্থতি বাড়িয়েছেন। আর কি ভাবে আধুনিক মানসসম্পদে আমাদের ভাণ্ডার ভরে তুললেন এঁরা, তা আমাদের অজানা

নয়। হয়তো, এভাবেই স্বভাবকবিত্ব নিন্দিত হয় একালে, কেন না জন্মসূত্রে শিক্ষা অর্জিত হয় না, তা অর্জন কোরে নিতে হয়, তাও বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির ব্যবহারে, আবিষ্কারে। মধুসূদন যে আধুনিকতার জল হাওয়া বাংলা কবিতার পুনর্জীবনের প্রয়োজনে বিদেশ থেকে আমদানী করলেন, তাতে আমাদের সাহিত্যচিন্তার স্রোতটাই বিপরীত দিকে বইতে শুরু করেছিলো। প্রথম, আমাদের সাহিত্যে তিনিই আন্তর্জাতিক মানুষ। গ্রহণে তাঁর কুণ্ঠা ছিলো না, কেন না তা মুমূর্ষু সাহিত্যের স্বাস্থ্যেরই জন্যে; অথচ একথা কি তিনি ভুলেও বিস্মৃত হয়েছিলেন, প্রকরণশৈলী বিদেশী মাটি থেকে ধার কোরে আনা যায়, বলার কথা এই মাটির গভীরে শিকড় চালিয়ে রস না শুষে নিলে রুগ্ন ফলবান বৃক্ষেরই জন্ম হতে পারে; আর তাতে যে ফল ধরে তার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক পাতানো অনেক সময়ই অসম্ভব? নিজের স্থান বুঝে নিতে তাঁর অসুবিধে হয়নি। অথচ দেখুন, তাঁর আপাত ঐশ্বর্যে বিভ্রান্ত হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের মূল-স্বভাব লিরিকের আবেগ-মথিত-কথনে, এটা তাঁরা বুঝেই উঠতে পারেননি। মধু-সূদনের সাহিত্য যে ভিন্ন ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করলো, প্রভাবিত হলেন যাঁরা, তাঁরা কোনো ভিন্নমাত্রা যোজনা করতে অক্ষম ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্ব-ভূমি খুঁজে নিতে সময় অপচিত হয়নি বলেই প্রতিষ্ঠা ও শ্রমের সহবাসে তাঁর অসামান্য সাফল্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো, অথচ তাঁর প্রভাবের চোরাবালিতে আত্মবিসর্জন দিতে লাগলেন স্বল্পবিত্তের তরুণ কবির দল। বুদ্ধদেব বসু এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্যই করেছিলেন—এঁদের ভ্রান্তি ছিলো কবি চরিত্রের মধ্যেই নিহিত; ঋণ পরিগ্রহণে আপত্তি নেই, তাকে সুদে-আসলে বাড়িয়ে তুলতে হবে; পেরেছেন কি তাঁরা? এরকম কোনো ভাবনা তাঁদের আপ্লুত করেনি; যা পেয়েছেন, তুষ্ট থেকেছেন তাতে। আধুনিকরা তা থাকেন নি। এমন কি উচ্চকণ্ঠ নজরুলও নয়। আধুনিকেরা বুঝেছিলেন, লিরিকের প্রচল ভাণ্ডার যেমন এদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দান, তেমনি, তার সবক'টি সম্ভাবনাই ব্যবহারে ব্যবহারে আবিষ্কারে নির্মাণে তিনি নিঃশেষে কোরে গেছেন; সুতরাং ওখানে আর পরিশ্রম পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই ইউরোপের কাছে হাত পাততে আধুনিকদের দ্বিধা হয়নি। ইউরোপের যুদ্ধোত্তর পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা শিল্পকলায় যে ভিন্নমার্গের সাহিত্যের বীজ বপন করেছিলো তার কাছে আমাদের পূর্বসূরিদের না গিয়ে উপায় ছিলো না। অথচ তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা এইখানে, তাঁরা উত্তমর্ণের দানকে প্রতিভায় সমন্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, খুলে দিয়েছিলেন আর একবার

সমুদ্রের খোলা হাওয়ার প্রাণ। জীবনানন্দও সতীর্থদের মতই শুরু করেছিলেন কিছু আগের পূর্বসূরিদের প্রতিভার অনুকরণের দ্বারা, কিন্তু খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নিজের বিচরণভূমি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই আত্মসম্বিৎ অর্জনে সহায়তা করেছিলেন কি বিদেশী কোনো আধুনিক সতীর্থ? হয়তো করেছিলো, হয়তো নয়; যে ইয়েট্‌সের নাম তাঁর প্রসঙ্গে নানাভাবে আসে তাঁর কাছে ঋণের পরিমাণ সামান্যই; কিংবা অমলেন্দু বসুর মতন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতের অভিমত মান্য হলে নিশ্চিত হই এই ভেবে, জীবনানন্দ উত্তমর্ণের কাছে প্রাপ্ত প্রেরণাটুকু প্রতিভার স্বকীয়তার দ্বারা বহুদূর অতিক্রম করেছিলেন। নিজের মৌলিকতার প্রশ্নে এই স্বভাব-নীরব কবি আত্মবিশ্বাসে পৌঁছেছিলেন ধূসর পাণ্ডুলিপির সময় থেকেই। তিনি সেই অতিমৌলিক উচ্চারণ নিয়ে এসেছিলেন, এ ধারণা তিনি কবিতায়ই প্রকাশ করেছেন; ভাষা ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব আবিষ্কৃত পদ্ধতি পাঠমাত্রই উপলব্ধ হতে থাকে; গড়ে নিয়েছিলেন শব্দ ব্যবহারের, শব্দ সংস্থানের নিজস্ব একটি বিন্যাসরীতি, কি অনায়াসে তিনি দুঃসাহসী হয়েছিলেন অপ্রচলিত দেশজ শব্দের বহুল ব্যবহারে। বহু বিদেশী শব্দ অকাতরে উজার কোরে নিলেন। অবাক লাগে, আধুনিকতার বিরোধী সাধু-ক্রিয়াপদের ব্যবহার তাঁর কবিতায় যত্রতত্র; বাক্যগঠনেব বিন্যাসপদ্ধতিও চলতি রীতির নয়। প্রবহমান পয়ারের মতন বহুল ব্যবহৃত ছন্দসিদ্ধিকে তিনি মুখ্যত ব্যবহার করলেন, অথচ শুধু মৌলিকতার জোরে তা এমন একটি সম্পূর্ণ স্বাদ-বিচিত্রতা অর্জন করলো, যা একান্তই জীবনানন্দীয়; যা আমাদের সদ্য-সৃষ্ট হয়েও ঐতিহ্য বলে স্বীকৃত, সেই আধুনিকতায় একক নিসর্গ নির্মাণে সাহায্য করলেন। আজ ভাবতে বিস্ময় জাগে, প্রকৃতির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ, যা আধুনিক কবির ধর্ম বিরোধী হওয়া উচিত, তার প্রতি তিনি দুর্মর পক্ষপাতী, অন্তত ধূসর পাণ্ডুলিপি, বনলতা সেন পর্যন্ত। সাতটি তারার তিমির থেকে মননশীলতা ও Precise emotion তৃতীয় একটি মাত্রা দিয়েছে তাঁর কবিতাকে। তথাপি, প্রতিপর্বে, পর্বান্তরে তিনি সফল বাক্‌রীতি নির্মাণ করেছেন, বাংলা কবিতার পাঠকের শ্রুতিসিদ্ধির বিপর্যয় বারংবার ঘটিয়েছেন, অথচ পাঠকের আশ্চর্য সমর্থনও আদায় করতে পেরেছেন তিনি। কখনও মনে হয় না জীবনানন্দের বাক্‌রীতি আমাদের স্বাভাবিক শ্রুতিব্যবহারকে আঘাত করে; খুবই স্বভাবজ, হয়ে-ওঠা যেনো; যেনে সচেতন নির্মাণ প্রয়াস নেই, নিঃশ্বাসের মতই স্বাভাবিক। এটা একটা অভাবিত অভিজ্ঞতা; হয়তো এই কারণেই তিনি

প্রভাবিত হতে প্রলোভিত করেন তরুণ কবিকে—'এ তো আমারই কথা, ঠিক এভাবেই বলতে চাই আমিও, পারিনি।' কিরকম বিমূঢ় করে নিজের অভাব বোধের তীব্রতা। অতিরিক্ত একটি যাদু—তা শুধু শব্দ বিন্যাসের অভিনবতা, না বক্তব্যের অমোঘ সত্যের ব্যঞ্জিত-ধর্মের জন্য, সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। দুটি চরিত্রই একটি বিন্দুতে মিশে আছে। গদ্যের সহজ চাল জীবনানন্দ ব্যবহার করেন নি তেমন, বরং গদ্য শব্দের বহুল ব্যবহারেও, যেখানে কবিতা ও ভাষণ মিশে আছে, সেখানেও নির্মাণের কলাকৃতির সচেতনতা হারান না তিনি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের বাক্ পদ্ধতির ফারাকও এখানে। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একান্তই কবিতার, ব্যঞ্জনায়িত লিরিকের দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে আক্রান্ত। পড়ছি যখন তখন কবিতাই তা, অন্য কিছু নয়। জীবনানন্দ কবিতার মূল সীমানা লঙ্ঘন না করেও গদ্যাক্রান্ত বিশেষ একটি বিন্যাসে সাজান শব্দ, যাতে আমাদের প্রাত্যহিক চালটির সঙ্গে যুক্ত থেকে নিরন্তর স্পন্দিত হতে থাকে; এইখানেই প্রতারক তিনি। আমাদের অচেতনে সংক্রামিত হতে থাকেন; অনুকরণ করা যায়না তাকে, এমনকি অনুসরণও নয়। করলেই ভরাডুবি। জীবনানন্দের বাক্ বিন্যাসের মধ্যে এমন একটি অন্তরাল-আশ্রয়ী চেতন-অচেতনের Scheme রয়েছে, যা আমাদের অভিজ্ঞতাকে অমোঘ আঘাতে বাজিয়ে দেয়; স্বাভাবিক কারণে তার কবিতার মুগ্ধ পাঠক কবিতা কি তা জেনে ফেলেন, এমন কি নিজেই লিখতে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন; এটা রবীন্দ্রনাথ পাঠেরও অভিজ্ঞতা।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন অনুজ কবিদের মৃত্যু রাবীন্দ্রিক চোরাবালির ষড়যন্ত্র না বুঝে তাঁর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হওয়ার জন্য,—বুদ্ধদেব বসুর এই সিদ্ধান্ত না মেনে উপায় নেই। আমরা তাঁর পরিণতি দেখি কি ব্যর্থতায় অবসিত। জীবনানন্দের মায়াবী ইশারায় ঠিক অনুরূপ আত্মবিসর্জনে বিস্মৃত হলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, যাঁর মৌলিক ক্ষমতা ছিলো না তা নয়, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে গেলো জীবনানন্দ-মুগ্ধতায়। কোনো ক্ষমতাবান কবি অন্য প্রতিভা, তা যতই প্রভাবশালী হোক, তার দ্বারা আচ্ছন্ন হন কি ভাবে? তা হওয়া কঠিন যে কোনো মৌলিক প্রতিভার, কেননা অন্যস্থষ্ট শিল্পের চূড়ান্ত স্ফূর্তিতেও তিনি আত্মসম্পূর্ণতা অনুভব করেন না; করেন না বলেই নিজের ক্ষমতা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হন তিনি; তাঁর অসন্তোষই তাকে ভিন্ন পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত করবে; যদি তা না হয়, বুঝে নেবো, তিনি যা চান, তাঁর কৃত্য অন্য কোনো প্রতিভার দ্বারা ইতিমধ্যেই চমৎকার ভাবে পালিত হয়ে গেছে। তাই তিনি এবং তাঁর শিল্প হয়ে পড়েছে তাৎপর্যহীন

রোমন্থন মাত্র। জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় এরকম আচ্ছন্নতাজনিত সর্বনাশ খুব কম কবিকেই মৃত্যুর পথে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মতন গুরুদেবের কাব্যকলাকে চূড়ান্ত সিদ্ধি বলে মনে করেননি জীবনানন্দ-উত্তর তরুণ কবি ; এইখানেই তাঁরা আত্মরক্ষা করলেন ; আছে ঐ মহৎ প্রতিভার সেই যাদুকরী ক্ষমতা যা অনায়াসে ঊর্ণনাভের মতন অরক্ষিত ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করতে পারে, কোরে তুলতে পারে রক্তহীন ; এটা যে হয়নি, আমরা তার জন্য গর্বিত, তাতে ঐ মহৎ প্রতিভার গুরুত্ব এতটুকুও হ্রাস পায় না, বরং বাড়ে, কেন না তিনিই শিখিয়েছেন ঐতিহ্যের ব্যবহার ও মৌলিকতা অর্জনের দ্বারাই আত্মরক্ষা করা সম্ভব।

জীবনানন্দ আমাদের প্রভাবিত করেছেন, তবে তা অন্যভাবে। যেমন ভাবে সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে গ্রাস করেছেন, পরবর্তী অনুজদের তা পারেন নি। একালের অতি সচেতন ব্যক্তিবাদী কবিতালেখক ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেবেন এটাই স্বাভাবিক। অতএব আপাতপ্রভাব, যা পাঠমাত্রই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, তাকে পরিহার করবেন সচেতন ভাবেই, করেছেনও তাই। তবে নতুন অভিজ্ঞতা যা, জীবনানন্দ থেকে প্রাপ্ত হলাম তাকে ঐতিহ্য হিসেবে ব্যবহার করা হলো নিজস্ব প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ; সে হিসেবে তিনি আমাদের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে আছেন। জীবনের অপরিশুদ্ধ আকাঁড়া দিক ব্যবহারে তাঁর সাহসী দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের ঝুঁকি নিতে সাহায্য করেছে। অভিজ্ঞতার ব্যবহারের পরিধিকে ক্রমপ্রসারিত করেছেন তিনি। শিল্পের শুদ্ধতার বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা প্রতিবাদে মুখর। বিশ্বাস করেছেন আমাদের সার্বিক অস্তিত্বের শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বরক্তিমতাকে কবিতার মাত্রা প্রসারে ব্যবহার করায়। এইসব এবং 'অবদমিত এষণার মানবীয় মূল্য, যা কখনো আমাদের কবিতার পরিশুদ্ধ জগতে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি, তিনি 'সাতটি তারার তিমির'এ তারও রহস্য তুলে ধরলেন। আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালী তরুণ কবিদের অবাধ অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশের জন্য সাহসিক ঝুঁকিগুলো তাঁরই হাতে। এই অতিনীরব, নিষ্কলুষ মানুষটিরই হাতে যখন গৃহীত হলো, আমরা অন্য এক বোধে পৌঁছোলাম, এক সিদ্ধির দুয়ারেও। অতএব, তাঁর প্রভাব নতুন জলবায়ুর নিঃশব্দ নিশ্চয়তার মতই। স্বাভাবিকতাকে প্রমাণ করতে হয় না। যেহেতু এটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছি বাঙ্গালী তরুণ পদ্যলেখক, তাই তাকে অনুবর্তন করার মানসিকতা গ্রাহ্য হয়নি তা নয়।

পঞ্চাশের দশকের শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি অন্ধকারে, অঘ্রাণের অনুভূতিমালা ইত্যাদি কবিতাগুলোয় জীবনানন্দের কণ্ঠে কথা বলেছেন। এঁদের কবিতার মধ্যে জীবনানন্দীয় পরিমণ্ডল কখনো সরাসরি এসেছে, কখনো একটু বেঁকে দুমড়ে; কিন্তু সার্বিক সত্য হলো, জীবনানন্দের কবিতার গঠনের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে পরবর্তী কবিরা, অধিকাংশই সচেতন থেকেছেন, তাই গত দু'দশকে প্রকরণশৈলী নিয়ে অন্তহীন পরীক্ষা চলেছে; শুধু জীবনানন্দীয় জলবায়ু থেকে ভিন্ন পরিমণ্ডলে যাওয়ার সচেতন প্রয়াসই নয়, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাক্‌রীতির মুগ্ধতায় আত্মবিসর্জন করেছেন এমনতর কবিদের ভয়ংকর পরিণতি সম-সময় ও পরবর্তী দশকগুলিকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলো, আত্ম প্রকাশের প্রশ্নে পরানুকরণের চেয়ে মারাত্মক বিপদ আর নেই। পৌঁছোতে হবে অথবা খুঁজে নিতে হবে সেই পূর্বখনিত পথগুলির বিপরীতমুখী কোনো না কোনো রাজাবর্ত্ম যেখানে তারই রথ চলবে একক মহিমায়। সেরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া এক, আর সিদ্ধিতে পৌঁছোনো অন্য কথা। সবক্ষেত্রে তেমন সার্থকতায় পৌঁছোতে বেশ দীর্ঘ পথ, পুরোনো পথ ধরেই হাঁটতে হয়েছে দীর্ঘদিন। কেউ কেউ শৈলীগত প্রশ্নে কিছুটা মৌলিকতা দেখিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। তথাপি অনুসন্ধানে কখনো ভাঁটা পড়েনি। তাই, জীবনানন্দের বাক্‌রীতি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হয়নি, প্রায় অব্যবহারে একক নিদর্শন হয়ে রইলো; কখনো কখনো কারো কারো রচনায় দু'একটি পংক্তি বা বাক্‌ভঙ্গি বা শব্দ অচেতন-ব্যবহৃত হয়েছে, সচেতন মনে সকলেই সচেতন জীবনানন্দের অতিমৌলিক 'পেটেণ্ট' ভাষা বা বাক্‌রীতি গ্রহণের বিপদ সম্পর্কে। তবুও, তাকে আমরা প্রধান কবি বলে গ্রহণ করেছি। সম্ভবত তিনি সেই কবি. তিনিই—যাঁর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই আমাদের, তাঁর অমোঘ উপস্থিতি আজকের বাঙ্গালী কবিতাপাঠক প্রচণ্ডভাবে মেনে নিয়েছেন। ভাবতেই পারা কঠিন, তিনি বাংলা ভাষায় লেখেননি এমন একটি অবস্থার কথা। তিনিই আমাদের আধুনিকতার উৎস ও ঐতিহ্য।

হালকা কবিতার বিরুদ্ধে

আমার তরুণ বন্ধুদের কারো কারো মুগ্ধ বিস্ময় মাঝে মাঝে ফেটে পড়তে দেখি এমন কোনো কবিতার পংক্তি বা স্তবক কিংবা আস্ত একটি কবিতা আবৃত্তি কোরে, কবিতা হিসেবে তা নাকি সব অর্থেই অসামান্য। আমি জানি, তর্কে নেমে শিল্পবিচার পণ্ডিতের সাজে, রসজ্ঞের আনন্দ উপভোগে। যেহেতু পাণ্ডিত্যের চাইতে উপভোগে আমার তৃপ্তি তাই লেখক হিসেবে যুক্তির চাইতে উপলব্ধিতে আমার বিশ্বাস। অতএব তরুণ বন্ধুর ঐ মুগ্ধতার উৎস আমি উপেক্ষা না কোরে, জেনে নিতে চাই সাবধানে তাঁর ভালোলাগার কারণ কি। আবার, এও এক কঠিন কাজ। ভালোলাগা ঠিক শব্দ দিয়ে বোঝানো যায় না; মনে মনে অনুভবেই তার সার্থকতা। তথাপি, আমরা এযাবৎ নানাভাবে পরস্পারের কাছে ব্যক্তিগত ভালোলাগা ব্যক্ত না কোরে পারিনি। না পারলে অব্যক্ততা আনে অফুরাণ যন্ত্রণা, তাই অসম্পূর্ণ অক্ষম শব্দের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চাই অন্তর্গত আকুলতার কথা। তরুণ বন্ধুও তা-ই চান। এও জানি, এ মুহূর্তে তাঁর মুগ্ধতা যে পংক্তি বা স্তবক বা গোটা একটা কবিতা নিয়ে, হয়তো কয়েক বছরের পরিণতি তাকে তারই প্রতি করবে বিমুখ। অর্থাৎ তাঁর ক্রমপরিশীলিত রুচি তাকে গভীর গভীরতর স্তর অনুসন্ধানে টেনে নিয়ে যাবে একদিন; তা-ই যায়। আমাদের কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে 'শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর' উন্মাদ কোরে রাখতো, কিংবা কঙ্কাবতীর অতি উদ্যমী টানা পংক্তির মাধুর্য। বুদ্ধদেব বসু সহজ স্বাভাবিকতায়, সরল আবেগী ভাষায় আমাদের মাতাল কোরে রেখেছিলেন। তখনো জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথের রহস্য সন্ধানের শ্রম স্বীকারের মানসিকতাই আমার অর্জিত হয়নি। যেতে না যেতে আঠেরো বছরের বসন্তসীমা, উপলব্ধি করলাম—এতোদিন যা জেনেছি তার সবটুকুই সত্যি নয়, আরো অনেক কিছু অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, যেখানে ভ্রমণ ছাড়া পাঠকের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হতে পারে না। হয়তো শৈশবই কাটে না। অতএব এবার সেই অজানা রহস্যময় দেশের দিকে পা ফেলো।

আমার পক্ষে চমৎকার সিদ্ধান্ত ছিলো এটা, অথচ সময় নিলো অনেক। খুব তড়িঘড়ি পড়ে ফেলার চাইতে অনুসন্ধানী আলোতে পংক্তি বা স্তবক বা আস্ত একটা কবিতার অন্তর্গত বোধ জেনে নিতে চাইতাম। বুঝেছিলাম—শব্দ ব্যবহারের রীতিগত একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে, যা বুদ্ধদেব বসুতে পাইনি, পেয়েছি সমসময়ের জীবনানন্দ, বিষ্ণু দের মধ্যে। যতোই দুর্বোধ্য মনে হতো, জেদ হতো, তার আবরণ খুলে দি। ক্রমে ক্রমে বুঝলাম শুধু ব্যবহারগত বিপর্যয় মাত্র নয়, প্রেম প্রকৃতি আর ঈশ্বর, তরল দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম ছাড়াও অন্য কোনো কবিতার দেশ, বিচিত্র অভিজ্ঞতার কোরাস এই ক্ষমতাবানদের গলায় বেজে উঠেছে। কী অসম্ভব আনন্দ এই নতুন বোধে পৌঁছে! আর তাকে উদ্দীপ্ত করলো সুকান্ত কিংবা সুভাষের ভিন্নমার্গীয় আবহ। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ভাবনা—ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত হতে হতে শুয়োরের মাংস হয়ে গেছে; গেছে নীতিজ্ঞের ভানও। সুরুচির ছেঁড়া পোশাকটা কি কদর্য! ভাবনাগুলো একের পর এক রাত্রির অন্ধকারে এক একটি তারার মতন জ্বলে উঠতে লাগলো। আমার জন্মান্তর হলো!

দেখেছি, দর্শনগত দিক থেকে বিরোধী পাঠককেও বিষ্ণু দের ক্ষমতাকে নমস্য বলে সম্মান জানাতে; অর্থাৎ সববিরোধিতার অবসান হয়তো শিল্পেই সম্ভব। কোথাও এমন কিছু উপলব্ধির দ্যুতি পাঠককে উত্তাল কোরে তোলে যা তাঁর সযত্নলালিত অভ্যাসকে চুরমার কোরে দেয়; হয়তো ঐ কবির সঙ্গে তার ব্যবহারিক বা সামাজিক আদান প্রদান বন্ধ কিংবা আভ্যাসিক স্তরে, তাতে কবি হিসেবে তার অনিবার্য আতিথ্য পেতে অসুবিধে হয়না। এইখানেই কবির জিৎ।

তরুণ বন্ধুর মুগ্ধতাকে অশ্রদ্ধা করা চলে না; যদিও তাঁর সঙ্গে রুচির প্রশ্নে বিপরীত মেরুতে অবস্থান আমার। আমি কবিতার বহুস্তর বিন্যস্ত শব্দ অন্বেষণে বিশ্বাসী। তরুণ বন্ধু একমাত্রিকতার প্রশংসায় সোচ্চার; আমি যখন কবিতার গঠনের ভিন্ন উৎকর্ষ ও সীমান্ত সন্ধানে গলদঘর্ম, তরুণ বন্ধু চলতি পয়ারের স্বভাবোক্তিকেই চরম শিল্পের উদাহরণ বলে ঘোষণায় মুখর। যে কারণে গত একদশক ধরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এলোপাথারি পদ্যচর্চা হাততালি কুড়োয়, আমি তার অর্থ বুঝি—সহজের আবেদন, তাৎক্ষণিকের ক্ষণবিদ্যুৎ বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। কারণ, এখানে পাঠকের পঠন পাঠনগত রুচি নির্মিতির

প্রশ্ন অবান্তর ; দোষ দিই না তরুণ বন্ধুকে, কেননা তাঁর পথ সামনে বহুবিস্তৃত ; অভিজ্ঞতার ক্রমপরিণতি তাকে একদিন পৌঁছে দেবে স্বভাবোক্তি ও উৎকৃষ্ট শিল্পবস্তুর সীমাস্বাদনের উপকূলে।

কবিতা ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য সূক্ষ্ম দাগের নয়। মোটা দাগের ফারাকটাও বোঝেন না এমন লেখকের দেখা এদেশে হাল আমলেই দেখি ; অন্তত এটা বোঝা গেছে, এইসব লেখক শব্দ ব্যবহার করেন স্বভাবের আদিম তাড়নায়, সভ্যতার নির্মিতি স্তরে উত্তরণে বিশ্বাস এদের নেই ; তাই অবিরল পদ্যচর্চা তথা ক্লান্তিহীন উৎপাদন ; নিজেকে ঘিরে অবিরল অনুকরণ ; কোনোভাবে একটা বাক্‌রীতি পেয়ে গেলে তাকে ছেড়ে ভিন্ন উৎসে ঝাঁপ দেবার ঝুঁকি এঁরা নেন না ; বিশ্বাসী নন নিজেকে, নিজের উপরে নানা কৌণিক আলো ফেলে আবিষ্কারে, বিশ্লেষণে ; বরং আবর্তন—অনবরত আবর্তনে সিদ্ধ, অভ্যস্ত—ক্রম-তরলীকরণে আস্থাবান ; মনে আসা আর লিখে ফেলার মধ্যে সময়ব্যবধান দিতে নারাজ। ফলত সংখ্যা বাড়ে, বিশেষ অভিজ্ঞতা ও চেতনার সমন্বয় থাকে না তাতে ; বলাব মতন একটা কথা হলেই পদ্য মেলানো চলে ভূরি ভূরি, কবিতার স্তরে পৌঁছোতে, নানা সোপান পার হতে হয়। মানুষই যেহেতু আজকের সবচাইতে এবং একমাত্র আলোচ্য, তাই মানবীয় তাৎপর্যমণ্ডিত অভিজ্ঞতা ও তার সারবস্তু শিল্পের, কবিতার প্রাণভূমি। উপলব্ধি করি না মানবীয় সম্বন্ধসূত্রগুলির সঙ্গতি ও অসঙ্গতি, আমাব ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান ও ভূমিকা—এইসব, যা আমাকে ক্রমশই দায়িত্ববান মানুষের ভূমিকায় দাঁড় করাতে সক্ষম। ব্যক্তির ইচ্ছে অনিচ্ছেব পরমমূল্য ব্যক্তিরই কাছে ; বহুর কাছে তার মূল্য সম্বন্ধের সাধারণীকরণে ; রবীন্দ্রনাথে সমন্বিত হয়েছিলো এই 'বহু-জীবনের আনন্দ।' একার সঙ্গে বহুর সম্বন্ধ উপভোগের, উপলব্ধিব ; ফলত দায়িত্ব এসেছিলো তাঁর, এসে যায় মানবীয় অভিজ্ঞতাকে শিল্পের বিষয় কোরে তোলার ; একার অর্থাৎ আমিত্বের বোঝা ঘাড থেকে নামিয়ে অসংখ্যের মধ্যে নিজেকে স্থাপন কোরে দেখার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার। তাই, হাল্কা হওয়া তাঁর চলেনি, চলে না আমাদের—এলোপাথারি ব্যক্তিগত আচরণকে বেশী মূল্য দিয়ে যেমন তেমন চলনসই গোছের পদ্য মেলানোয়।

আমরা চল্লিশের দশকের কবিদের নিন্দায় সোচ্চার হই, ভাবি না—ওই সময় সব অর্থেই দায়িত্ববান কিছু কবি, গদ্যকার স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছেকে দূরে

সরিয়ে চমৎকার একটি দূরদৃষ্টি দেখিয়েছিলেন। অসংখ্যের অভিজ্ঞতার অংশীদার হবার শৈল্পিক তাড়না—এইমত একটি বোধ তাঁদের 'ব্যক্তি আমি'কে 'বিশ্ব আমি'তে পৌঁছে দিয়েছিলো। হয়তো, এই সময়ের তরুণ কবি, গল্পকার তাঁদের বিরুদ্ধ উজানের রাজনীতিক সময়ের কাছে পাঠ নিয়েছিলেন; অথচ দেখুন—সাহিত্যকে রাজনীতি প্রচারের কাজে ব্যবহারের ঝোঁক বেশ ব্যাপক ভাবে তখন আসেনি তা নয়, কিন্তু কেউ কেউ আত্মরক্ষাও করেছিলেন; অর্থাৎ শিল্পের শর্ত বিস্মৃত হননি কখনো; যেহেতু সময়ের দাবি—মানবীয় কর্ম, অভীপ্সার অংশীদারত্ব যা তাঁরা স্বীকার কোরে নিয়ে হলেন দায়িত্ববান। আবার শিল্পী হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব তাঁরা ভোলেন নি; আমাদের কাছে আজ, চল্লিশের সুভাষ মঙ্গলাচরণ হরপ্রসাদ দিনেশ দাস কিরণশঙ্কর রাম বসু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করেন; কবিক্ষমতার 'তর' 'তম' বাদ দিয়েও এঁদের দায়িত্ব ও শিল্পবোধকে অস্বীকার করা চলে না; তাই হাল্কা চালের পদ্য লেখার কোনো দৃষ্টান্ত অন্তত এঁদের রচনায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

হাল্কা কবিতা আর উত্তীর্ণ কবিতার মধ্যে পার্থক্যটা কেমন? ব্যক্তিসর্বস্ব কবিও তো সিরিয়াস ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে জানিয়ে দেন। আমার পৃথকিকরণ এই ভাবে—যেখানে কবির উচ্চারণের মধ্যে লঘুতা প্রকাশ পায়, বিষয় নির্বাচনে চলতি বিশ্বের তাৎক্ষণিক ঘটনা বা নিজস্ব জীবনাচরণগত তুচ্ছ ঘটনা প্রধান হয়ে ওঠে, যে কবিতায় শব্দ কোনো সুদূরবাহী তাৎপর্যে জ্বলে ওঠে না, মাত্রই সাংবাদিকের দায়সারাগোছের কর্তব্য সেরে ফেলতে উৎসুক, যেন একটি সংবাদ জানিয়েই তার দায় শেষ, এমন কবিতা, যা বাইরের অলংকারগত দাবির কাছে নত, গভীর উপলব্ধির চাপে সংযত নির্মাণ পায় না, যা মিলবিন্যাস শব্দ ব্যবহারের চাতুর্যে উপরিতলে রয়ে যায়—তা-ই হাল্কা কবিতা।

জীবন যে রকম, তার উপস্থাপনা, সহজ সাংবাদিকতার ভংগিতে বলে যাওয়া জনপ্রিয়তা অর্জনের সুযোগ এনে দেয়; অর্থাৎ এও আমাদের জানা, কবিতা বা যে কোনো শিল্প মূলত কোনো একটি তাৎপর্যমণ্ডিত সংবাদই তুলে ধরে, আর তা এমন একটি সলজ্জ সংকেতে যে আমাদের অভিজ্ঞতায় তা কখন নতুন রাজ্যখণ্ড জুড়ে দিয়ে যায়; হয়তো ওই অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়, আমাদের চলতিজীবনে মাঝে মাঝে ওর সংগে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু কোনো শিল্পী তাকে এমন একটি 'প্রকাশ' দিলেন যা চিরকালের মানবীয় অভিজ্ঞতার অংশী হয়ে গেলো। এখানে কবি এরকম একটি নির্মাণে পৌঁছোতে কঠিন স্ব-বিরোধিতার

সঙ্গে যুদ্ধ কোরে চলেন। মাঝে মাঝে অহং বড়ো বেশী প্রাধান্য পেতে চায়, কবি তার একমুখিন স্রোতকে চালিয়ে দেন ভিন্ন পথে ; ব্যক্তিসর্বস্বতা এক্ষেত্রে, এই আত্মসচেতনতার গুণে পেয়ে যায় সামান্যিকরণের চরিত্র। এখানে প্রথম থেকেই কবি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন, ভোলেন না, তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তখনই অসামান্য তাৎপর্য পাবে অন্যের কাছে যার মধ্যে অন্য একটি মানুষ খুঁজে পাবে তার অভিজ্ঞতার কোনো না কোনো সূত্র ; সে বা তারা শিল্পের সঙ্গে নিজের অন্তর্গত তাড়নায় মিলিয়ে দেবে নিজেকে, অর্থাৎ আত্মলোপ ঘটবে তার।

মহৎ শিল্পে আত্মবিলোপ ঘটাতেই পাঠক বা দর্শক বা শ্রোতার আনন্দ। মাতালের অভিজ্ঞতা 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে' নিছক ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা, আর একটি মাতালের প্রবল ঘোরের সময় ঐ পংক্তি বা কবিতাটি উচ্চারণের ইচ্ছা জাগে হয়তো ; শিল্পের কাছে যে কারণে মানুষ যায় সেই সংকটে ওর মূল্য কিছুই নেই ; ওটা হাল্কা কবিতা, কিংবা এই পদ্য লেখকের অসংখ্য পদ্য এলোপাথাবি লেখার উদাহরণ, ব্যক্তিমানুষের ক্রমপরিণতির কোনো চিহ্ন ধারণ কোরে নেই ; কিংবা বিশেষ কোনো উচ্চারণ ভংগিও নেই তাঁর আয়ত্ত। ফলত হাল্কা কবিতা অর্থাৎ গুরুত্ব আছে এমনতর রচনার পূর্ণ অভিজ্ঞতার পথযাত্রা যাতে সূচিত এমনতর কবিতা এঁর তেমন নেই, রচিত হতে পারে না, কারণ স্বভাবেই এই লেখক হাল্কা মেজাজেব, দায়িত্ব নেই সমাজের বা নিজের, কাবো প্রতি।

বাংলা কবিতায় হাল্কা কবিতাব শুরু ঈশ্বর গুপ্তে। ভাষা ব্যবহারে, বিষয় নির্বাচনে তাঁর ভংগিটি প্রথম থেকেই খোসমেজাজী। তিনি কবিতাকে সংবাদের স্তব থেকে অন্তশ্চেতনার বলয়ে কখনো নিয়ে যেতে পারেন নি, হয়তো এই প্রক্রিয়াটি তাঁর জানা ছিলো না। তিনি আত্মসর্বস্ব—একথা মূর্খেও বলবে না, খুবই গভীর গম্ভীব দার্শনিকতা তাঁর আছে, অর্থাৎ যেন উচ্চারণের মধ্যে রয়েছে হাল্কা চাল, বোধউত্থিত নয়, অনুভূতি অনুরঞ্জিত হয়নি, তাই সিরিয়াস বিষয়ও হাস্যকর হয়ে ওঠে ; এটা কবিব মর্জিগত, মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠার সাধ্য কি তার ? জনগণের কাছে মস্করার নগদ বিদায়ে তিনি খুশী, কিংবা মস্করাকে মস্করা বলে জানেন না, তাই এতো সহজ নির্দ্বিধ উচ্চারণ—

ঠক্‌ঠক্ শব্দ করি ঘুরাতেছে মালা।
ভাবিয়াছ দশের যশের তুমি শালা ॥

চাল নাই, খুঁটি নাই, নাহি গুণ লেশ।
কেমনে হইবে শালা বল না বিশেষ॥
ঠক্‌ঠক্ ঠোকে যবে, আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি মালা ঘুরাইলে॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে।
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে॥

এর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য, কিন্তু প্রকাশরীতিতে হাল্কা চাল। কেউ যেন মনে না করেন, দেশজ চলতি শব্দের ব্যবহারে কবিতার গুরুত্ব লঘু হয়ে পড়ে। ঘটনাটা আদৌ তা নয়, বরং তার বিপরীত; সব দায়িত্বশীল কবির মনো-বাসনা পাঠকের সঙ্গে একটি সম্বন্ধসূত্র নির্মাণ করা, আর তা হবে কবিতারই মাধ্যমে, অতএব ভাষার ক্ষেত্রে তাকে চলতি চালটি আয়ত্ত না করলে চলবে না। যদি অপ্রচলিত শব্দ বা বাক্‌রীতিকে আঁকড়ে থাকেন তিনি, এই সম্বন্ধসূত্রটি যাবে ছিঁড়ে; তার তাবৎ প্রয়াস পণ্ড হবে তাতে; অতএব, ভাষার চলতি চালটিকে ব্যবহারের, অবশ্য নিজস্ব বাক্‌রীতির সঙ্গে যুক্ত কোরে আয়ত্ত করতেই হবে। তাহলে, ঈশ্বর গুপ্তে আপত্তি কোথায়? তাঁর মতন চলতি ভাষা ব্যবহারে সাহসী সমকালীন বা পরবর্তী কোন কবির মধ্যে দেখেছি? আপত্তি —তাঁর সৃষ্টি প্রেরণার, অর্থাৎ দেখাটাই উপরিতলের, গভীর বোধ-উৎসারিত উচ্চারণ কি তা তিনি জানেন না; ছন্দ-মিলের সোজা রাস্তায় চলাতেই তাঁর উৎসাহ ফুরায়। অথচ দেখুন, ঈশ্বর গুপ্ত ভাষার ক্ষেত্রে অসম্ভব সাহসী, ওখান থেকে বাংলা কবিতার যাত্রা শুরু হতে পারতো, পারলে জনমনে তার প্রভাব হতো দৈনন্দিনের। মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক ভাষার ভিন্নপথে—অনেকটা গ্রহণ বর্জনের; বাংলার মূল ধারার ভিন্নমার্গে; কিন্তু এঁরা ছিলেন সব অর্থেই কবি; কবি শব্দের অভিধানগত অর্থ ছাড়িয়েও এঁদের কবিক্ষমতা। ফলত ভাষার কৃত্রিমতা একটা নান্দনিক সিদ্ধি আয়ত্ত করলো; খুলে গেলো পোশাকী ভাষার সম্ভাবনার দরজা; শব্দের জাদু বা স্বরবিন্যাস আমরা রবীন্দ্রনাথে উদ্ধার কোরে পেলাম; বৈষ্ণব মরমিয়াদের সঙ্গে সঙ্গতি আছে হয়তো; ক্ষতি হয়নি তাতে, বরং আলাদা একটি বিশ্ব নির্মিত হলো—সুরুচির, সৌন্দর্যের, পরিমিতির, প্রজ্ঞার; আমাদের নতুন ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার; আর তার ব্যাপকতার নিবিড় মোহ থেকে সমকালীন তরুণ লেখক পরিত্রাণ পেলেন না, সম্ভবও ছিলো না হয়তো।

ফলত, বাংলা ভাষা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, শাক্তকাব্য ঈশ্বর গুপ্তের দেশজ বাক্‌রীতির মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো ; পাঠকও দ্বিধাবিভক্ত ; কবির সঙ্গে পাঠকের যে ছেদ শুরু হয়েছিলো ইংরেজদের শহরমুখিন সভ্যতার শুরুতেই, তা ক্রমশই বাড়তে লাগলো, নগর-সংস্কৃতি গ্রাস করলো লোকায়ত ভাষা-রীতিকে ; আটপৌরে দৈনন্দিনের ধুলোকাদার ভাষা বর্জিত হলো, সাহিত্য হয়ে উঠলো পোশাকী খানদানি মেজাজের।

আমরা, বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠী হারালাম। শিল্পায়নের পরবর্তী ধাপে সব দেশেই হয়তো এই ফারাকটা বেড়েই গেছে ; সাহিত্য শিল্পকলা মুষ্টিমেয় সুরুচিবানের পোশাকী জীবনেব অংশী হলো, সর্বসাধারণের নয়। আমাদের ইংরেজপূর্ব ভারতে সাহিত্য সর্বসাধারণের ছিলো, পরে তার পার্থক্য দূরবিস্তারী ; খণ্ড ব্যক্তিত্বের ছাঁচে ভাষার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হলো। পাঠকও ব্যক্তি-রুচির নির্বাচনকে মর্যাদা দিতে শুরু করলো। পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন শিবির—ইতিহাসেরই নিয়মে।

অতএব, মূল দেশজ শব্দ বা বাক্‌বিধি পরিত্যক্ত হলো, হয়তো এপথে ক্ষমতা-বানের আবির্ভাবে চেহারাটা হতে পারতো অন্যরকম। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সদিচ্ছা ক্ষমতার সঙ্গে সমন্বিত হয়নি, নজরুলের কবি-ক্ষমতার অভাব উচ্চরোলে চাপা পড়লো সাময়িকভাবে। প্রথম এ পথে প্রভূত শক্তি নিয়ে এলেন জীবনানন্দ। সেটা প্রয়োজন ছিলো, নিজস্ব সাংস্কৃতিক মানের ভাষাশৈলীর সঙ্গে ব্যাপক প্রচলিত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নতুন জনসংযোগ-সূত্র রচনা—তা জীবনানন্দে পেলো আকাঙ্ক্ষিত শিল্পরূপ। তিনি কবি ছিলেন সবঅর্থেই, তাই তাঁর ছুঁৎ অচ্ছুঁৎ বিচার ছিলো না, ছিলো আত্মিক তাড়নাকে প্রকাশের ব্যাকুলতায় প্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহার। ঠ্যাং, গাডোল, কেসে, পুঁজরক্ত, হাইড্রেন ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ, যার অসাবধান ব্যবহারে কবিতার গুরুত্ব হাল্কা চালের সাংবাদিক-তায় পরিণতি পেতে দেখেছি পঞ্চাশী কবিদের কারো কারো লেখায়। তিনি সফল ব্যবহারে তাকেই নতুন মাত্রা এনে দিলেন। কেনো এটা সফল হলো ? দেখার দৃষ্টি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ, ছিলো গভীর ও আয়ত বহুমানুষের অভিজ্ঞতার সারাৎসার অন্তশ্চেতনায় সংগত কোরে নেবার অসামান্য ক্ষমতা। মনে পড়ে কি এমন একটি কবিতাও তাঁর যা জীবনের কোনো না কোনো অভিজ্ঞতার স্পর্শ বিন্দুকে স্পর্শ কোরে নেই? শুধুই ব্যক্তিক হাহাকার, মাতালের অসম্বদ্ধ উচ্চারণ ? ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে বেলা অবেলা কালবেলার দ্বন্দ্ব রক্তক্ষরণ আর মানবীয় রক্তোজ্জ্বল উপলব্ধি আর কোন্ কবিতে এমন ভাবে দেখেছি ? জীবনের দিকে

দৃষ্টির জটিলতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয় শুধু তাঁরই মধ্যে দেখি, তাই অনিবার্য তাঁর কবিতা আমাদের প্রাত্যহিকের। কিন্তু সমর সেন তো ব্যঙ্গনৈপুণ্যে দেখার মাত্রা বাড়িয়েছিলেন, যা সেখানে নেই তা গভীর সহানুভূতিসিক্ত উপলব্ধি; লঘু কবিতার উত্তীর্ণ নিদর্শন সমর সেনে; এটা ধরা শক্ত বটে। পাশাপাশি সুভাষের ব্যাপক প্রচল-শব্দ ব্যবহারের, নিছক বাক্‌শৈলীর চলতি ঐতিহ্য যুক্তকরণ ইত্যাদি সাফল্যে উত্তীর্ণ হলো; কেন না—সুভাষ দায়িত্ব গ্রহণে ছিলেন তৎপর, সিদ্ধিও ঘটলো তাতেই। বোঝা যাচ্ছে, হালকা কবিতা শব্দ ব্যবহার বা রীতির কোনো ভেদে জন্মে না, ওটা গুরু শব্দ আর গম্ভীর কৌশল প্রয়োগেও হতে পারে; আর তা ঘটে কবির হালকা জীবন-উপলব্ধির কারণেই; নিজেকেই, নিজের আচার আচরণকেই আত্যন্তিক মূল্যবান মনে করার মধ্যেই তার লঘু-আত্ম-বিশ্বাস প্রকট হয়ে ওঠে। বিষয় হিসেবে তাই তাঁদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে ঘোরাফেরা, স্বভাবেই এঁদের ভ্রান্তি, গুরুত্ব শিল্পে আসা সম্ভব নয়; আর তারুণ্য যখন স্থির, কোনো প্রাজ্ঞ উপলব্ধি আয়ত্ত করতে অক্ষম, সেখানে এই লঘুচালের কবিতাকেই অনুকরণে আপন শক্তি নিঃশেষিত কোরে ফেলে বাংলা কবিতায় হাল আমলে পঞ্চাশী উল্লম্ফনের যে ধরনের স্তাবক জোটে, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তা জোটা ভার; জানি, এটা সাময়িক, তবু এর মারাত্মক প্রাদুর্ভাব শিল্পের সুস্থ অবিচ্ছিন্ন উৎকর্ষকে সাময়িক গ্রাস করতেও পারে। স্বভাবোক্তিকে কবিতার চুরিদার পরিয়ে বাবু সাজিয়ে জাতে তোলার অশিক্ষা এদেশে বাহবা পাচ্ছে দেখে সুস্থতার পুনরুজ্জীবনের ভরসা রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

কবিতা বিচার

'ভালো লাগে' অথবা 'ভালোলেগেছে আমার' শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে অনেকেরই ধারণা—শেষ কথা। যদি প্রশ্ন তোলা যায়, ভালো লাগার কারণ কি? ব্যক্তিগত রুচির উপর শর্ত আরোপ কোরে উত্তরদাতা তখন আত্মতুষ্টিতে মগ্ন হয়ে পড়েন। প্রশ্ন করতে পারি, ভোক্তার সাড়া দেবার ক্ষমতাকে. এবং তা করাও উচিত, তাতে আত্মবিশ্বাসে সামান্যতম আঘাত হয়তো লাগবে, কিন্তু প্রশ্নকর্তা এ বিষয়ে নিরুপায়। পাঠকের প্রস্তুতি সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মন্তব্য বহুশ্রুত বটে, তথাপি তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করার আজও কোনো কারণ ঘটেনি। এখনও আমাদের সাহিত্যপাঠের রুচি, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে বেশী মূল্য দেয়। অথচ এদেশে ব্যক্তির রুচিগঠনে ব্যক্তিগত প্রতিভার বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ছাড়া সংঘবদ্ধ তত্ত্বাবধান দেখা যায় নি। যে দেশে এখনো গ্রামীণ সরল জীবনের প্রশংসার কথায় শিক্ষিতজন পঞ্চমুখ, নাগরিক জীবনযাত্রার সঙ্গে রফা কোরে গ্রাম্য আচরণবিধির গৌরবই প্রশ্রয় পায়, দু'দুটো মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জটিলতা অন্তর্জগতে সামান্যতম সন্দেহ সংশয় তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি, সে দেশের সাধারণের রুচির উপর সিরিয়াস সাহিত্যের বিচারের ভার ছেড়ে দেওয়া মূর্খতারই সামান্য লক্ষণ। জেগে ঘুমোবার ভান যে করে তাকে কাতুকুতু দিয়ে হয়তো জাগানো সম্ভব, কিন্তু নিদ্রাকেই নির্বাণ বলে ভাবতে শেখে যে তার ক্ষেত্রে কঠোর না হয়ে উপায় নেই।

রুচিপরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা দেখতে পেলেই আঁতকে ওঠা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধানবৃত্তি, যা মানবীয় বোধের বিস্তার ঘটাতে সবচেয়ে সহায়ক, তা জড়ত্ব পেতে বসেছে। অভ্যস্ত শিল্পরীতির বিরোধিতাকে বিদ্রোহ বলে সনাক্ত করায় আমাদের উৎসাহ। সুধীন্দ্রনাথ পাঠকের আলস্যকে দায়ী করেছিলেন সংগত কারণে, কেননা পাঠকের দায়িত্ব সম্পর্কে অসচেতনতা এদেশে কখনই নিন্দিত হয় না, ব্যক্তির অভিরুচিকে এক্ষেত্রে শেষতম বিচার বলে মান্য হতে দেখি, দেখি না পাঠক-ব্যক্তিত্বের যোগ্যতা আছে কিনা—এ

সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বিরক্তিভাজন হবার মতন ব্যক্তিত্ব।

অবশ্য, যা আপাতনতুন বলে দাবি করা হয়, তা শিল্পোত্তীর্ণ নাও হতে পারে; অতএব শিল্পের উত্তীর্ণতা প্রসঙ্গে বিচারযোগ্য মনস্বিতা অর্জন খুবই জরুরী। ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা প্রাচীন আলংকারিকদেরও খুব পছন্দ ছিলো বলে মনে হয় না। সংস্কৃত আলংকারিকদের পাঠকের প্রস্তুতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত বাতিল হবার নয়। মনকে দর্পণের সঙ্গে তুলনা, আর নিরন্তর পাঠচর্চার মাধ্যমে তার উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তোলা, যে কোনো অনুভূতির ইশারায় সাড়া দেবার মতন মানসিকতা গঠন—এই আলংকারিক সতর্কতা এখনো সমানই মূল্যবান রয়ে গেছে।

প্রশ্ন হলো, কবিতা ও পদ্যের স্তরবৈষম্য প্রশ্নে ধারণা গড়ে নেবার পূর্বাহ্ণিক প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে কিনা। যেহেতু, রুচির ক্ষেত্রে স্বাদ-ভিন্নতা প্রাচীন-কাল থেকেই স্বীকৃত পদ্ধতিমাত্র, ফলত ব্যক্তিগত রুচির উপর শিল্প বিচারের দায়িত্ব অর্পিত হলে অবিচারের আশংকাও বর্তায়। প্রশ্ন রাখতে চাই, যে ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে এতটা গুরুত্ব দিতে যাচ্ছি, আছে কিনা তার পঠনপাঠনের ঐশ্বর্যে গঠিত একটি সাড়া দেবার উপযুক্ত মন ও মনন। এ দেশে, যেখানে নিরক্ষরতার সীমাহীন অভিশাপে গ্রস্ত মাত্রাতিরিক্ত মানুষ, স্কুল কলেজের নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির বাইরে যাদের অধিকাংশের যাতায়াত সারা জীবনে ঘটে ওঠে না, সে দেশের এইসব সাধারণের রুচির অসম্পূর্ণতাকে পরমমূল্য দেওয়া চলে কিনা, এ প্রশ্ন সিরিয়াস শিল্পী মাত্রই উত্থাপন করতে পারেন, অন্তত উপেক্ষা করার মানসিকতা তৈরীর যথন পরিবেশ রয়েই গেছে। নীতিগত প্রশ্নে আমি সাধারণকে পাঠক হিসেবে অস্বীকার করি না হয়তো, কিন্তু ভরসা পাই না যদি বলি এদের রায় গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে, কেননা শিল্পীকে গরিষ্ঠতার মানদণ্ডে বিচারের আমি বিরোধী। যেহেতু প্রকৃত শিল্পী মাত্রই অভিজ্ঞতার বহুস্তর অগ্রসর হয়ে কাজ করেন, উপস্থিত হন একটি সিদ্ধান্তে, আবার তা ভেঙে দেন অনায়াসে অন্য একটি ধাপ গড়ে তুলবার জন্যে, অতএব, তার ভুয়োদর্শী ব্যক্তিত্বকে ভুল কিংবা মনোযোগের অনুপযোগী ভেবে সাধারণ পাঠক অনেক সময়ই ব্যক্তিগত অহংকারকে মূল্য দেবার প্রয়োজনে নির্বিচার মতামত ব্যক্ত করেন অকুণ্ঠভাবে; তাতে মূল্য পায় প্রয়োজন-পূর্তির দিকটা, তাৎক্ষণিকের দাবির যৌক্তিকতা সেখানে বেশী; প্রসারিত সময় পরিধিতে যুক্ত কোরে দেখার যে মনন শিল্পীত বস্তুতে আপাতপ্রচ্ছন্ন রয়েছে তাকে শ্রমসাধ্য

জেনে গুরুত্বকে লঘু কোরে দেখানোর প্রবণতা প্রশ্রয় পায় নিশ্চয়।

কেমন কোরে চিনে নেবো পদ্য থেকে কবিতাকে ? কেউ যদি কবিতাকে সন্দেহে 'পদ্য' বলে চিহ্নিত করেন, বুঝতে পারি, শিল্পবোধের একটি অস্বচ্ছতা এর জন্য দায়ী। লেখার ইস্কুল প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু লেখার ইস্কুল গঠনের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একথা বলতে ভোলেননি, লেখা শেখার ক্ষেত্রে আত্ম-নির্ভরতাই জরুরী শর্ত : চলনসই লিখিয়ে হয়তো লেখার ইস্কুলে পড়ে তৈরী হওয়া সম্ভব, কিন্তু জাত লেখককে পাঠ নিতে হবে তাঁর পূর্ববর্তী কৃতি লেখকদের রচনার কাছ থেকে। যিনি চাইবেন নিজস্ব একটি স্টাইল, যা তার অনন্য ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করবে সঠিক ভাবে। তাকে অবিরাম ভাষাচর্চার দুরূহ সবগুলি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলতে হবে। যে অভিজ্ঞতাটি তার এ মুহূর্তে প্রকাশ না কোরে মুক্তি নেই, তাকে এমন ভাবে প্রকাশ কবতে হবে ইতিপূর্বে তেমন আর কোনো লেখকের আয়ত্তে ছিল না। অতএব এই রীতিগত প্রশ্নে ভাষাকে ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা পেতে হবে। আবার অভিজ্ঞতাটি খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের হলেও তার উচ্চারণ যেন নৈর্ব্যক্তিক বিস্তার পায়, দেখতে হবে তা-ও ; তা হবে এমনই —ইতিপূর্বে সমঅভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ কোনো পূর্বসূরিব রচনায় দেখা মেলেনি ; অর্থাৎ বিষয় এবং উপস্থাপনাব ক্ষেত্রে অনন্যনির্ভরতাব নামই স্বকীয়তা, ভুললে চলবে না।

অবশ্য, এ যুক্তিতে সাব যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। এই যন্ত্রজটিল নাগরিক জীবনে ব্যক্তিত্বের খণ্ডীকরণেব ফলেই কোনো সবজনীন শিল্প আজ আর অসম্ভব। স্প্লিট পার্সোনালিটিই এ যুগের অস্তিত্ব সংকটের বীজরূপে নিহিত ; অতএব শিল্পীতে শিল্পীতে ভিন্নতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই পাঠকেরও একই নিয়মে রুচিগত ভিন্নতা স্বীকৃতসত্য : থেমে থাকলে চলবে না এখানে। উত্তীর্ণ শিল্পের বিচারযোগ্য মানদণ্ড কি হবে তা না জানা থাকলে অবশেষে ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দের তীব্রতাই যুক্তি হিসেবে সত্য বলে স্বীকৃত হবে একদিন।

কবিতা প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বলেছিলেন : কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক-ধরনের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিষ—শুদ্ধ কল্পনা কী একান্ত বুদ্ধির রস নয়। মন্তব্যটিতে কবিতার অন্তত আধুনিকতার আত্মার উচ্চারণ প্রোথিত রয়েছে। এর মর্মান্তিক ইংগিতকে চমৎকার শুদ্ধজ্ঞানে ও অনুভূতিতে সঞ্চারিত কোরে নিতে হবে ; কেননা অন্তত এই বক্তব্যটির মধ্যে

আধুনিক শিল্পে—বিশেষত কবিতার ও কবির চরিত্র কি হবে তার সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে—মনে করি। কবি—একদা সত্যদ্রষ্টা বলে বন্দিত ছিলেন যখন, জড়িত ছিলো তার সঙ্গে অতিলৌকিক জাদু বা ইন্দ্রজাল—একথা সত্য, তথাপি এক বালকদ্রষ্টা যখন আধুনিকতার পুরোহিত বোদলেয়ারকে দ্রষ্টা বলে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তখন আর আদিম জাদুজড়িত অতিমর্ত্য প্রশ্রয় পায় না,—এক্ষেত্রে কবি এমনই এক লৌকিক ব্যক্তিত্ব যার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী—নয় তা সমালোচকের নির্মমতায় শাণিত বরং সহানুভূতির নিবিড় আবেগে মানবীয়-তায় চূড়ান্ত স্ফূর্ত; যার মধ্যে ভালোবাসার অতিরিক্ত কোনো ঐশ্বর্য নেই—যা আছে তার নামও ভালোবাসা; মাত্রই আবেগতাড়িত নয়; ক্ষমায়, প্রেমে হিংসায় পাপে নিষ্ঠুরতায় এক সংমিশ্রিত পূর্ণ মানবতার প্রতিমূর্তি। কবি এই সম্পূর্ণ মানবীয়তার প্রেমিক, কেননা, তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ভাবেন না কখনো, তাবৎ বিষ পান করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই; মেধা ও হৃদয়ের চর্চা তাঁর ধর্ম; অনুসন্ধান তাঁর নিত্যক্রিয়া; সংশয় তাঁর চারিত্রিক অস্খালনযোগ্য অপরাধপ্রিয়তা, এবং অবিরল আত্মহনন ও অভিজ্ঞতার সারাৎসারে ঋদ্ধ তাঁর চিত্তবৃত্তি; যার চাইতে উৎকৃষ্ট কোনো অবস্থা কল্পনা করাও যায় না; অতএব জ্ঞানের সীমাহীন সঞ্চয় আর আত্মার তাবৎ ঐশ্বর্যের চর্চা তাকে নিয়ত ব্যথিত ভাবনাব্যাকুল এমন এক ব্যক্তিত্বে স্থাপন করে যখন মন্তব্য উত্তীর্ণ হয় প্রবচনে, অনিবার্য উচ্চারণ হয় অমোঘ কবিতায় উত্তীর্ণ,—যা সহজেই পেয়ে যায় সাধারণ গুণযুক্ত প্রবচনের ধ্রুবকঠিন চরিত্র; অন্যথায় যিনি মাত্রই কল্পনায় কোরে চলেন দাসত্ব, বিপরীতে মেধার বশ্যতা, তিনি কবিতাকে পদ্যের সমানুপাতিক অর্থে ভাবেন কিংবা জ্ঞানের পদ্যবন্ধকেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ভাবায় কোন অসঙ্গতি দেখেন না।

অভিরুচি গঠনের অভিভাবকত্ব কবিতা পাঠকের নিজস্ব বিষয়। কেন তিনি কবিতার কাছে যাবেন, কোন দায় কিংবা তাড়নায়? নিছক আনন্দ দিতে পারে না আজ আর কবিতা; কেননা, তার কাজ চৈতন্যের বহুস্তরের উন্মোচন; মাত্রই নিসর্গ বর্ণনা, আধ্যাত্মিকতার কূট-উপলব্ধি বা ছন্দগ্রন্থিত শব্দরহস্য মাত্র নয়, বরং নৈসর্গিক জীবনতার খণ্ড খণ্ড অনুভূতিমালার সামগ্রিক তাৎপর্যের সন্ধান; ফলত পাঠকেরও সুপ্ত অভিজ্ঞতার তাৎপর্য সঙ্গত সজ্জায় কবিকর্মে প্রোথিত হয়ে আছে; পাঠক কবিতার আয়নায় দেখেন নিজেরই মুখ—শুধু মুখ নয়, অন্তর্জগতের বহুস্তরবিন্যস্ত চেতনার উন্মোচন আবিষ্কার

করেন। যে কবিতায় এই বিস্তার ও গঠন শব্দে শব্দে বেজে ওঠেনি, তাৎক্ষণিক তৃপ্তি দিলেও মহৎ শিল্পকর্ম নয় বলে জেনে নিতে হবে তাকে। যদি কবি এই জাগতিক অবস্থানের মূল্য সংযত শব্দগ্রন্থনে ভাস্বর কোরে তুলতে না সমর্থ হন, তবে আজকের অভিজ্ঞতাজর্জর পাঠকের কাছে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর ; অতএব নেহাৎ ভালোতে আর খুশী হবার অবকাশ মিলছে না, কবিতাকে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তির সহায়ক হতে হবে, বিচারের মানদণ্ড এরকম একটি আয়ত্ত মানসিক গঠনের হাতে থাকতে হবে।

কবিতা ভালো কি মন্দ, এই মন্তব্য নিক্ষেপের আগে ভাবতে হবে

[ক] প্রাচীন ও আধুনিকতার বৈপরীত্য স্বভাবগত ভাবেই কতখানি

[খ] সাম্প্রতিক ও সদ্যরচিত সার্থক লেখকের রচনার তুলনা করার যোগ্য মননচর্চা আয়ত্ত হয়েছে কিনা

[গ] বিদেশী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশের সঙ্গে পরিচয় আছে যেভাবে ও যতোখানি, তুলনামূলকভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও স্বদেশের ক্লাসিক ও সাম্প্রতিক রচনার সগেও পরিচয় আছে সেইভাবে ও ততোখানি ; অর্জন করতে হবে তুলনামূলক মননচর্চার নৈর্বক্তিক অভিজ্ঞতাও।

নিরন্তর পঠনপাঠন ব্যতিরেকে মানসিক প্রস্তুতি-চর্চা অসম্ভব ; সাড়া দিতে সক্ষম এমনতর অন্তর্মনের তন্ত্রীগুলোকে ঘষেমেজে উজ্জল ও সচল কোরে তোলা ; পঠনজাত অভিজ্ঞতার ক্রমবৃদ্ধিই তা পারে। পাঠের পরিধির বিস্তার যেমন প্রয়োজন, তেমনি যে লেখা তার ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে নাড়া দেয়, তাকে বেশী প্রয়োজনীয় ভাবতে শেখা এ ক্ষেত্রে জরুরী। একবার পড়লেই যা ভালোগোছের প্রশংসা আদায় কোরে নেয়, ভাবায় না, ভাবতে শেখায় না, জাগিয়ে তোলে না কৌতূহল, বারবার পাঠে উৎকণ্ঠিত কোরে তোলে না, আজ আর তেমন রচনাকে কবিতার সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা চলবে না, কেননা ঐ সারল্যেব সার্বিক উপাসনা কবিতার শৈশবকালের চরিত্র ; কেননা, তখন কবিতা থাকে পংক্তি-গঠনের সামঞ্জস্যের, মিলের সহজ বিন্যাসের, বর্ণনার যথার্থতার, স্বভাবোক্তির স্তরে—যা পদ্যেরই সঠিক চরিত্র ; কবিতা নয় তা ; তা-ই কবিতা যা সুন্দর কি, ভাবতে শেখায়, তুলে ধরে নিরন্তরস্পন্দিত হতে হতে অন্তর্জাত উপলব্ধির বহুধা-ব্যঞ্জনা, জানাতে পারে স্বনির্ভর শব্দেব যাদুকে, মেলে দিতে পারে অনভিজ্ঞ অভিজ্ঞতার দুজ্ঞের্য় জগৎ—এইসব।

স্বীকারোক্তির শিল্প

ব্যক্তিসত্তার সমস্যামন্থিত উপলব্ধিই শিল্প, স্পন্দনই কবিতা। অবশ্য, এ ব্যক্তি স্বয়ম্ভু নয়, শিকড় ছড়িয়ে বেড়ে ওঠা বোধিবৃক্ষ। বহুমানুষের সীমাহীন অভিজ্ঞতার সারাৎসার গ্রহণে পুষ্ট এক বামনাবতার, ত্রিজগতেই যার সাম্রাজ্য-বিস্তারী আকাঙ্ক্ষা। বেঁচে থাকার শর্ত তাই শিল্পেরও সূক্ষ্ম পরিণাম ; অন্তত এদেশে—এই সময়ের শিল্প সংকটতাড়িত ব্যক্তির উপলব্ধির অনুরণন।

'উপলব্ধির অনুরণন' শব্দগুচ্ছের নিহিত ব্যঞ্জনা এমনই যা মোটাদাগের অভিজ্ঞতাকেও শিল্পের স্বীকারোক্তির পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। 'সিরিন' শিল্পবস্তু কি সম্ভব এখন, না আমরা চাই ? ঘটাতে হবে মেলবন্ধন—অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পসুষমার। শিল্প হবে এমন যা যে কোনো জীবিতমাত্রের অনিবার্য অন্তরঙ্গ সুহৃদ ; অবশ্যই অন্তর্গত সাম্রাজ্যের। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গলিপ্সু সারমেয় মহাপ্রস্থানেরও সঙ্গী ; আজকের শিল্প সর্বক্ষণের—শ্মশানে রাজদ্বারে দুর্ভিক্ষে শত্রুসংকটে সর্বাবস্থায়। ভালোমন্দ, পাপপুণ্য, সুন্দর কুশ্রীতার মিলন মিশ্রণে তার শরীর হবে পূর্ণাঙ্গ মানুষের হয়ে ওঠারই ইতিহাস, জৈবসত্তার মানবিক হয়ে ওঠার আর্তি। সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের ভাষায় জীবনানন্দের আগে দেখিনি। বকলমে উপস্থাপনার রীতির শেষ সম্ভাবনা নিঃশেষ হতে দেখেছি ররীন্দ্রনাথে। শরীরটাকে জোব্বা জড়িয়ে রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা তাঁর কাছে ছিলো নান্দনিক সমস্যার সমাধান। আর তিনি রেখেছেন স্বীকারোক্তি ও-পাড়ার কথা না বলতে পারার। অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন তাঁর রচনায় যত্রতত্র। জৈবসত্তার সমস্যা অন্তত চতুরঙ্গে, এই তুলনাহীন শিল্পকর্মে জৈবিক আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগমন পর্যন্ত একমাত্র উদাহরণ। মানুষ ছাড়া উপাস্য নেই শিল্পের ; আর সেই মানুষ খণ্ডিত ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ পীড়িত উচ্চাকাঙ্ক্ষী তৃপ্তিকামী স্বপ্নমুগ্ধ কর্মী ও কামুক। অতএব, বিশুদ্ধ শিল্পের ধ্বজাবাহী মুখোমুখি হতে পারে না খঞ্জ মানুষের দৈনন্দিনের। তাই ব্যক্তিমনের

শূন্যোত্থানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আত্মমৈথুনের আনন্দে মগ্ন হয়। একালের শিল্প কোন্ সত্যে পা রেখে উত্তরণের চেষ্টা করবে জানা তাদের সামর্থে কুলোয় না। প্রশ্ন তাদের প্রাচীন, প্রায় বাতিল নন্দনতত্ত্বের—সজনে ফুল আর গোলাপের মধ্যে কবিতার রাজ্যে স্বীকৃতির দাবি কাব বেশী, অর্থাৎ সেই নির্বাচনের প্রশ্ন। চতুঃবর্ণাশ্রমশাসিত সমাজে শূদ্রের বেদপাঠের অধিকার নেই, —আমরা অন্তত ইতিহাসের এই পর্বে এসে এমন মুণ্ডচ্ছেদের অনুশাসন অস্বীকার করেছি। শিল্পে তাই ত্যাজ্য নয় কেউ, কিছু নেই পরিত্যাজ্য। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রীয় বৈশ্য-শূদ্রের সমানাধিকার এখানে; অতএব বিশুদ্ধতারক্ষার বাতিল প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে না আর।

অন্যদিকে জীবন যা স্বীকৃতি নেই তার; যা হতে চায় শব্দকে চালিত, করছে সেই দিকে। ফলত স্পন্দনহীন শুকনো শব্দসংস্থান শিল্প বলে পেতে চায় স্বীকৃতি। আমরা এদেশে সংকটে টালমাটাল নৌকোর আরোহী। উভয় শিবির বর্জন করতে চেয়ে তৃতীয় বিশ্ব, যা নতুন নন্দনতত্ত্বের আভাসে ইংগিতে সম্পূর্ণতা চায় —আবিষ্কার করতে উন্মুখ। স্বদেশ ও বিদেশেব ভিন্ন দেশকালের মনীষীর দ্বারা খনিত পথে জমেছে নানা মত পথের আবর্জনা; জরুরী হয়ে পড়েছে তাঁদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া দু একটি শব্দ যা এসময়েব শিল্পেব পক্ষে অবশ্যমান্য। পূর্ণতাপ্রয়াসী মানুষের হয়েওঠার পথের অন্তরায় যে শ্রেণী, যা কিছু প্রেক্ষিত তার বিরুদ্ধাচারণ করাই সার্থক শিল্পের দ্বান্দ্বিক অগ্রসরণ। হয়েছেও তাই—দান্তে বা সেরভান্তিস, গ্যেটে বা হাইনে, ভলটেয়ার বা বালজাক, সেক্সপীয়ব বা বায়রন, পুশকিন বা ডষ্টয়েভস্কি, মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথ; জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দে; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর, এঁরা সময়কে বুঝতে চেয়েছিলেন স্থির কোনো সত্যের আলোকে নয়, চলমান দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষের ভাঙাগড়ার টানা-পোড়েনে। মানুষই বিগ্রহ। তার উত্থানপতনসংকুল খণ্ডিত জীবনের সূক্ষ্ম অণুসূক্ষ্ম অনুভূতিব ইতিহাসই শিল্পের ইতিহাস; তাৎপর্যময় অন্বেষণই শিল্প, অবশ্যই অন্তর্জগতের। ভাবং অভিজ্ঞতাই জরুরী, আর তার কাডা আকাডা উপস্থাপন, নিষ্কাষণ ও কেলাসনই শিল্প। বঙ্কিমে শুদ্ধতার গোঁড়ামি, তার পূর্ণতা পায় রবীন্দ্রনাথে। অতিরিক্ত যে শুচিবায়ুগ্রস্ততা খণ্ডিতদেশার জন্ম দেয় আধুনিক শিল্পের পক্ষে তা পরিত্যাজ্য। দুই মেরুতে এদেশে এই মানসিকতার সাম্রাজ্য। পণ্ডিতি বাছবিচাবে শিল্পবস্তু মার খায়; তাই মধুসূদনের বীরাঙ্গনার

পত্রগুচ্ছে যে সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিলো, ব্রাহ্মজ্ঞানীদের আর খৃষ্টীয় প্রভাবে ভাবিত এদেশীয়দের হাতে তার বিনষ্টি পেতে দেরী হয়নি। যে সমরেশ বসু গঙ্গা লেখেন তাঁর হাতে বিবর প্রজাপতি কেন—এ প্রশ্ন করার মূর্খামী প্রশ্রয় পেয়েছে এই কারণে যে কানু ছাড়া গীত দেখলেই আমাদের গোঁড়ামিপুষ্ট অহমিকাতে আঘাত লাগে, অথচ কানু বিষয়ক রচনা বৈষ্ণবীয় শাসন মেনে সংবেদন হারায়, তা ভুলে যাই।

সমস্যার শরশয্যায় শুয়ে উনিশ শতকী রোমান্টিকতার প্রতি আসক্তি বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়োজনে লাগে হয়তো, আমাদের বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পের সহযাত্রা আরো জরুরী মনে হয়। শিল্পকলাকে শ্বাসপ্রশ্বাসের মতন জরুরী হয়ে উঠতে হবে, আর তা হতে পারে জীবনকে নির্বিচারে গ্রহণেরই মাধ্যমে, অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে ভেদরেখার বিলুপ্তি ঘটাতে হবে ; শ্রেণীবিভক্ত অভিজ্ঞতার স্বীকরণও পরিত্যাজ্য নয় ; বেঁচে থাকার প্রয়োজনে লাগে এমত তাবৎ উপাদান ও অভিজ্ঞতার পরিগ্রহণে একালের শিল্প অনিবার্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

গ্যেটের পরম সুহৃদ মের্ক তাঁর প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'যা বাস্তব তুমি দাও তাকে কাব্যরূপ'। এই বাস্তব কি, প্রসঙ্গত গ্যেটে স্বয়ং তার ব্যাখ্যাও করেছেন। আমরা এই শব্দটি এখন গ্রহণ করবো আভিধানিক অর্থেই, যদিও গ্যেটে-ব্যাখ্যাত বাস্তবতার সঙ্গে পার্থক্য তাতে দুস্তর নয়। যে পরিপার্শ্বস্থ আবহে দৈনন্দিন জীবনচর্যা তার প্রতিফলনই বাস্তবতা। অবশ্যই রিপোর্টারের দৃষ্টিতে যে খণ্ডিত মুহূর্ত বর্ণনাময় ভাষা পায় তাতে ব্যক্তিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় থাকে না। উপরি-তলের। দেখা সাংবাদিকের চরিত্র, আর অন্তঃস্তলের দৃষ্টি যা দর্শনেরই সমানধর্মী —শিল্পীর তাই মিনা কাউট্স্কিকে লেখা এঙ্গেলসের উপদেশের সারবত্তা খুবই জরুরী মনে হয়। আয়ত্ত করতে হবে দৃষ্টি থেকে দর্শন যা-বহুসংখ্যক মানুষের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে ঋদ্ধ, সমর্থিত, এমত দেখা ; আর যে ভূমিতে ব্যক্তি-শিল্পীর বিচরণ তাকে অনুভূতির ঐশ্বর্যে বোঝা, শব্দবদ্ধ করা। এভাবে অ্যাটিচ্যুড অর্জিত হবে, তা প্রকাশ পাবে রচনায়—যাতে সমান অভিজ্ঞ মানুষ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সমর্থন খুঁজে পাবে। নিজ নিজ হওয়া-না হওয়ার উপলব্ধির ইতিহাস পেয়েছে যেখানে অন্তরঙ্গ শব্দরূপ, প্রয়োজন আছে তার আত্মদৃষ্টির স্বচ্ছতা অর্জনের। এছাড়া শিল্পের আর কি কাজ ব্যক্তি বা সমষ্টি মানুষের জীবনে ? অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তৃতি ঘটানো ছাড়া কি-ই বা

সে করতে পারে ? অতএব, যদি এমত কোনো দায় আছে শিল্পীর—মেনে নিই আমরা, তবে বিশুদ্ধতা শব্দটি বাতিল হয়ে যায় ; যে শব্দটির শরীরে শুচিবায়ুগ্রস্ত বিকার জড়িয়ে আছে, জীবনের পূর্ণাঙ্গ পয়িচয় দানের ক্ষেত্রে তাকে পরিত্যাগ না কোরে উপায় কি ?

অবিমিশ্র রোমান্টিকতা শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর, তাতে থাকে নীরক্ত ঔদাসীন্য। বস্তু-সংহত শারীরী অভিজ্ঞতায় যা মেলে না, হয়তো 'দেহ মনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে' এমত নির্বিকার অনুভূতির ক্ষণকালীন প্রসঙ্গে নিহিত রয়েছে তা ; পরক্ষণেই—ফিরে আসে মন দ্বন্দ্বযুক্ত শারীরিকতায়, তাই শ্লেগেলের উক্তি রোমান্টিক ধর্ম প্রসঙ্গে 'Progressive universal poesie' মান্য হলেও সব কবিতাকেই শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক স্বপ্নস্বর্গের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হবে—এরকম ঔচিত্যবোধের বিরোধিতায় নামতেই হয়; কেননা অবিমিশ্র রোমান্টিকতায় প্রোথিত রয়েছে প্রতিক্রিয়ার বীজ ; অন্তত রোমান্টিকতার সূতিকাগারে রুশোর মন্তব্য তাইই প্রমাণ করে। 'প্রকৃতিতেই বিশুদ্ধ সুখের সম্পদ সঞ্চিত এমত মন্তব্য তখনই সম্ভব যখন সভ্যতার অগ্রগতিতে সন্দিহান হয়ে পড়েন রুশো ; ব্যাক টু নেচার কি সভ্যতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে না ? বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের অরণ্যজীবনের প্রতি আসক্তিরও কারণ। অন্তত বিশ শতকের শেষার্ধে এসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা ব্লেকীয় অর্থে রোমান্টিকতার আনুগত্য অসম্ভব, এখানে আমাদের দীক্ষাগুরু সেই মহান ফরাসী কবি যাঁর থেকে পাঠ নিয়েছিলেন আধুনিকতার উদ্‌গাতা তৎকালীন ও পরবর্তী কবি ও লেখক ; রোমান্টিক কবি অতিমাত্রায় বিশুদ্ধতাব চর্চায় আগ্রহী হন বলেই বোদলেয়রের বস্তুবীক্ষণ নিন্দিত হয়; কেননা তিনি একাধারে এই সত্যকে মেলাতে পেরেছিলেন—বস্তুভারস্বচ্ছ উপলব্ধির দর্শন ও প্রকাশকলার ক্ল্যাসিক সংহতি ; অন্তত ফরাসি দেশের তৎকালীন রোমান্টিক বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন তিনি। তাঁর মতন শুদ্ধ শিল্পী আব কে ?

আমাদের শুদ্ধতা শুচিবায়ুগ্রস্ততারই নামান্তব ; তাই বুদ্ধদেব বসুব মন্তব্য 'যা কিছু পবিত্র তাই ব্যক্তিগত' মর্যাদা পেতে চায় শিল্পেরও যথার্থ ডেফিনেশন হিসেবে ; তাই যে দেশকালের প্রেক্ষিতে জীবনযাপন, তার বস্তুভার না হলেও ইংগিতমাত্রও ধরা পড়ে না বিশুদ্ধবাদীদের রচনায়; কখনো এঁরা অনিবার্য পাঠ্য বলে মনে হয় না। উনিশশতকী দেবেন সেন, অক্ষয় বড়াল, কুমুদরঞ্জনের মানসিকতার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ এঁরা ; মাত্রই স্বাতন্ত্র শব্দসংযোজনায় ;

এঁদের মানসিকতার আশ্চর্য মিল এমন কি রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালী পর্বের কবিতার সঙ্গে ; এঁরা ধরতেই পারলেন না এর পরে জীবনানন্দ এসেছেন নতুন পদ্ধতি ও বিষয় নিয়ে অর্থাৎ দৃষ্টির ভিন্ন কোটির নাগরিক আধুনিকত্ব নিয়ে ; এসেছেন বিষ্ণু দে ; সুধীন্দ্রনাথ, এসেছেন সমর সেন ; অর্থাৎ এইসব পূর্বসূরিদের আধুনিকতা কোথায় ধরতে পারেন নি তা—বলেই এঁদের রচনার কোনো গঠনমূলক প্রভাব স্বভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে নি ; মাঝে মাঝেই মনে হয় পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি পিঠে কোনো শরফলকের চিহ্ন না নিয়েই এমন সিরিন শিল্পচর্চার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে ? তাহলে কি নাগরিক সভ্যতার কোনো প্রভাব এদের গ্রাম্য স্বভাবের বিন্দুমাত্র বদল ঘটাতে পারেনি ?

প্রসঙ্গত নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিগত প্রশ্ন এসে পড়ে। যেহেতু শুদ্ধশিল্পে ব্যক্তির স্থানই মুখ্য এবং নৈর্ব্যক্তিকতা সোনার পাথরবাটি নয়, ব্যক্তির নিরাসক্ত পৌরুষও। অবান্তর অতএব মৌল উৎস ব্যক্তি হলেও, তাব জাগরণ, তার ক্ষয় ও ক্লান্তি, তার আশাভঙ্গ ও উজ্জীবন শিল্পের জরুরী উপাদান; এ ব্যক্তি বিশেষ দেশকালের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠ ; শিল্প যেহেতু উপলব্ধির বাঙ্ময়প্রকাশ, অতএব ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব তার নির্মিতির মূলে সক্রিয় থাকে ; আবার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব একই দেশকালে নানা বিপরীত দেখায় স্বাতন্ত্র পায়। তুজাতের শিল্পী ভিন্ন পথ ব্যবহার করেন এই প্রকাশেব ক্ষেত্রে ; কেউ ব্যক্তিত্বকে আড়ালে না রেখে মূর্ত কোরে তোলেন নিজস্ব দেখার সংসক্তি ; কেউ বা স্ব-স্বভাবকে প্রথম থেকেই গোপনে রাখতে চান সাধারণীকরণের আকাঙ্ক্ষায়। ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে ফেলা, কীটসের সংজ্ঞায় negative capabilily, সেকসপীয়রে যাব চূড়ান্ত প্রকাশ, কোনো ভাবে খুব সুলভ নয়। রোমান্টিক কবির স্বভাবেই ব্যক্তিত্বের চাপা-প্রস্রবণ থাকে ; যে কোনো ভাবে তার প্রকাশ ঘটে যায়। সেক্সপীয়রের নাটকে এই নৈব্যক্তিকতা বা negative Capability-র দেখা পাই, কেননা নাটক, অন্তত আধুনিকপূর্ব নাটক ছিল কাহিনীনির্ভর ; নৈর্ব্যক্তিকতাই তার ধর্ম; কিন্তু তিনি সনেটগুচ্ছে ঘটিয়েছেন ব্যক্তিস্বভাবের নৈসর্গিক মুক্তি। কীটসেও তাই। স্বভাবে শেলী স্ব-স্বভাবকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন ; আমরা তাঁর কান্না শুনতে পাই, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ একটি মারাত্মক উক্তি করেছিলেন যা রোমান্টিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। 'কবিকে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'—এ বক্তব্য যদি

মেনে নিই তবে বোদলেয়রকে, শেলী বা কীটসকে—তাদের তাবৎ অভিজ্ঞান-জড়িত শিল্পকে মেনে নেওয়া যায় না। ঐ মন্তব্য রবীন্দ্রভক্ত প্রমথ চৌধুরী এভাবে সমর্থন করেন· 'মানুষের সাংসারিক জীবনের সঙ্গে তাঁর মানসিক প্রকৃতির যে কোনও সম্বন্ধ নেই এমন কথা আমি বলতে চাইনে। কিন্তু সে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ নয়। আর এই দুই প্রকৃতির শিকড় এক নয়। আমাদের লৌকিক জীবনের মূল মাটিতে, অপরপক্ষে কবিমন উর্ধ্বমূল অবাঙশাখ, সে শাখায় অসংখ্য ফুলদল আবির্ভূত হয়।"

একই প্রসঙ্গে বলছেন 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তারা ভুলে যান যে বড কবির অন্তরে double personality আছে ;—একটি সাংসারিক personality, অপরটি লৌকিক নয়, লোকোত্তর প্রকৃতি।"

বিশুদ্ধ শিল্পবাদীরা এভাবে লোকোত্তর শক্তিকেই শিল্পসৃষ্টির উৎস ও প্রেরণা ভাবেন হয়তো এবং এমত শুদ্ধিমার্গে বিচরণ-আকাঙ্ক্ষাবশত লৌকিক বিচরণ ভূমিকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখতে ভালোবাসেন ; যে ভাবনা তাদের শিল্পে প্রকাশ পায় তা যে পদার্থ-সন্নিবিষ্টশরীর এই মাধ্যাকর্ষণবন্ধনজড়িত পার্থিব জীবন থেকেই নেওয়া, আশ্চর্যজনক বিমূঢ় বালকের মতনই ভুলে যান তা অনায়াসে ; ডাবল পারসনালিটি বলতে কিছুই বোঝায় না ; কবিতা বা যে কোনো শিল্পই স্রষ্টার জীবনযাপন—এ সত্য অস্বীকার্য হতে পারে না বা বিজ্ঞান সমর্থিত সত্যও নয় ; ব্যক্তির জীবনযাপন ও পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতাই শিল্প সৃষ্টির মৌল উপাদান ; ব্যক্তিত্ব এ ক্ষেত্রেও এবং সবক্ষেত্রে প্রধান ; শুচিবায়ুগ্রস্ত বিশুদ্ধবাদীদেব উটপাখীসদৃশ শিল্পচিন্তা বায়ুভুক জননকৌশল; একালে আমাদের তাতে প্রযোজন নেই।

'অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?' এই প্রবচনচবিত্র পংক্তিটি সুধীন্দ্রনাথের যিনি আবাল্য কলাকৈবল্যবাদী। সুধীন্দ্রনাথের কবিতাপাঠে এধারণা প্রশ্রয় পায় না, তিনি চোখ ফিবিয়ে তাকাননি দৈশিক কালিক সমস্যাপীড়িত মানুষেব দিকে ; অবশ্য তাঁর দেখায় দার্শনিকতা ছিলো ; যেহেতু তাঁব জীবনযাপন আভিজাত্যের উচ্চমার্গে, যেহেতু তাঁর পঠন পাঠনের ঐশ্বর্য তাঁকে যুক্তিমার্গিক কোবে তুলেছিল, অতএব ক্লাসিকনিষ্ঠ শিল্পচর্চা ছিলো অবশ্যম্ভাবী। তিনি প্রকৃত কবির মতন নিজের বিচরণ ক্ষেত্রের পরিধি জানতেন, জানতেন বলেই অন্তত

ভুল করেননি। আর জীবনানন্দ এক্ষেত্রে যেহেতু আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যের অভিমানে অহংকারী নন, একজন দ্রষ্টা মানুষের অসামান্য উপলব্ধিকেই ভাষা দিতে পেরেছেন, তাই। তিনি আনন্দের ও নৈরাশ্যের সমঅংশভাগী হতে পেরেছেন; জড়িত থেকেছেন আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষের পার্থিবতার দায়ভাগে গ্রস্ত থেকে; তাই তাঁর কবিতা অনিবার্য হতে পেরেছে। তাঁকে নৈর্ব্যক্তিকতার আভিধানিক অর্থে নিরাসক্ত বলা চলে না, কেননা তিনি এবং তাঁর উপস্থিতি তাঁর শিল্পে সর্বত্র, ভাষায় তাঁর ব্যক্তিত্ব, ভঙ্গিতে ও বিষয়ে তিনি সর্বত্র উপস্থিত, তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত, ফলে নিরন্তর স্পন্দিত হতে থাকে, সমানধর্মীর মূক হৃদয়েও নিরন্তর; কি কোরে বলবো, তিনি বিশুদ্ধ শিল্পের উপাস্য ছিলেন; তিনি বাংলা কবিতার শুচিবায়ুগ্রস্ত পঙ্গু শরীরে প্রথম আঘাত করলেন; এমন সব শব্দ বেছে নিলেন যা কোনো অর্থেই সুন্দরের এলাকা অর্থাৎ কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি এতোদিন, তিনিই প্রথম কবিতার অবচেতনের ভয়ংকর রহস্য তুলে ধরতে পেরেছেন; বিষয়বস্তুও এমন যা এযাবতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে না; তিনি বেঁচেছিলেন সব অর্থেই; পীড়িত হয়েছেন, উদ্বেল হয়েছেন, গ্রস্ত থেকেছেন বিষাদে; মানুষের জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত জীবন তাঁরও—বোঝা যায়, তাঁর পরিণতির ইতিহাস জেনে নিলে; হয়তো তাঁর এক অর্থে প্রচ্ছন্ন কালাপাহাড়িপনা যা রবীন্দ্রনাথের কাছে সিরিনিটির অভাব, এ প্রসঙ্গে শুভঙ্করই ছিলো।

আর বিষ্ণু দে? সময়কে বুঝেছেন; মানুষের জাগৃতির দুরাশা ও অমোঘ আকাঙ্ক্ষা; ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক অগ্রসরণ সম্পর্কে সুস্থির বোধ। যুক্তি-নির্ভর একটি আধুনিক ভাষা তাঁর ছিলো; ফলত তিনি যা বলেছেন বা বলেন তা মাটিতে সিক্ত ভয়ংকর শিকড় ছড়িয়ে প্রাণ অপান সংগ্রহেরই সাহায্যে; তাঁর রচনা একটা পরিকীর্ণদেশকাল সন্ততির হয়ে ওঠার সাফল্য অসফলতার ইতিহাস ধারণ কোরে আছে। ত্রিশের কবিদের মধ্যে বিশুদ্ধতা রক্ষার আপ্রাণ প্রয়াসী বুদ্ধদেব বসু বা অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য বুদ্ধদেবের কবিতায় মানবিক আবেগ স্পন্দিত; বিশেষ কোরে প্রেমের যৌবনসন্ধির উদ্বেল কামনা ও প্রৌঢ়ত্বের বিষাদ বর্তমান; কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর রচনায় মানুষ নিঃসম্পর্কিত দেশের ভৌগোলিক অস্তিত্ব বা 'নিতান্ত দার্শনিকতা' প্রশ্রয় পেয়েছে। এঁরা দুজনেই সাড়া দিতে পারেন নি, অথবা চাননি সমকালের অবশ্যআগ্রাসী পীড়ন—পীড়া উদ্ভূত সমস্যার আহ্বানে; আর প্রেমেন্দ্র মিত্র ফেরারী ফৌজ বা বেনামী বন্দর

এজাতীয় কবিতায় সময়কে ধরতে চেয়েছেন আবেগের উৎক্ষেপণে; জড়িত করেছেন নিজেকেও, যদিও রক্তমোক্ষণ ঘটেনি তাঁর উপস্থিতির অমোঘতায়; তথাপি তাকে বিশুদ্ধ শিল্পীদের সমভুক্ত করা চলে না কোনো ভাবেই।

অতিরিক্ত সংস্কার-আকাঙ্ক্ষা কখন কুসংস্কারে দাঁড়িয়ে যায়; অতি বামপন্থা বস্তুজগতের এতাবৎ চর্চাকে অগ্রাহ্য কোরে যে স্বয়ম্ভু শিল্প রচনা করতে চেষ্টা করে তাতে থাকে না জাগতিক মানুষের দিনযাপনের ক্লেদ ও কারুণ্য; সংগ্রাম ও শান্তির স্পন্দমান আবেগ। কুসংস্কার উভয়তই প্রবল। বর্জন করতে হবে দু'দুটো খনিত ও আবিষ্কৃত পথই। আমাদেব থাক মিলিত অগ্রগতি। শিল্পের ইতিহাস যাই হোক, নতুন ঐতিহ্য রচনায় সুখে-দুঃখে পাপে-পুণ্যে পতনে-উত্থানে সংসক্ত দ্বান্দ্বিক দোলাচলে মানুষের হয়ে ওঠার সামগ্রিক সত্য স্থাপন করতে হবে; ব্যক্তি—যে ব্যক্তি বহুমানুষের বহুস্তর উন্মোচিত অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী সেই জীবিত সত্তার সব সমস্যা, অন্তর্গত ও বহির্জীবনের সকল অভিজ্ঞান শিল্পের পক্ষে জরুরী এবং অবশ্যমান্য কোরে তুলতে হবে; যে তা করবে না সে বা তারা 'আধুনিক' এ মর্যাদার অধিকারী হবে না; শুদ্ধতা অর্থ সোনার পাথরবাটি, আমাদের অবশ্যই এমত ফাপা সংজ্ঞার্থকে বর্জন কোরে মিলটনের উক্তিকে সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে: Give me the liberty to know, to utter, and to argue freely according to conscience, above all liberties.

সাহিত্য ঃ উদ্দেশ্য

"এমনিতে মোটেই আমি উদ্দেশ্যমূলক কবিতার বিরুদ্ধে নই। ট্রাজেডির জন্মদাতা ইস্কাইলাস আর কমেডির জন্মদাতা অ্যারিস্টোফেনিস—এ'রা দুজনেই নিশ্চিতভাবে প্রচারধর্মী কবি ছিলেন। দান্তে আর সেরভান্তিসও ছিলেন তাই। শিলার-এর 'ক্রাফ্ট্ অ্যাণ্ড লাভস্'-এর গুণই প্রধান এই যে এটি জার্মান ভাষায় প্রথম প্রচারধর্মী নাটক। রাশিয়া আর নরওয়ের আধুনিক লেখকরা অপূর্ব সব উপন্যাস লিখেছেন। এ'রাও সকলে উদ্দেশ্যবাদী। কিন্তু আমি মনে করি, এই পক্ষপাত, কোনো বিশেষ ইংগিত ছাড়াই, পরিস্থিতি ও ঘটনার মধ্যে থেকে নিজের তাগিদেই অভিব্যক্ত হওয়া উচিত। যে-সামাজিক বিরোধের বর্ণনা করা হল পাঠককে তার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক সমাধান বাতলে দিতে লেখক বাধ্য নন। বিশেষ করে আমাদের সমাজের এই অবস্থায় উপন্যাসের আবেদন প্রধানত বুর্জোআ-গোষ্ঠীর পাঠকদের কাছে, যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। সেই কারণে আমার মতে, সমাজবাদ-পক্ষপাতী উপন্যাস যদি সত্যনিষ্ঠ থেকে বাস্তব সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্কগুলিকে বর্ণনা করে, বর্তমান সমাজব্যবস্থার চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় জাগিয়ে তোলে, তাহলেই সে উপন্যাসের উদ্দেশ্য পুরোপুরি সিদ্ধ হয়—লেখক কোনো নির্দিষ্ট সমাধান নাই বা হাজির করলেন, খোলাখুলি কোনো পক্ষের হয়ে নাই বা দাঁড়ালেন।"

মিনা কাউট্স্কিকে লেখা এঙ্গেল্সের চিঠির ছিন্ন অংশটি আমাকে লেখকের দায় সম্পর্কে সচেতন করে; ভাবতে শেখায়, যে সমাজ-ভূমিতে আমার অবস্থান উচিত হবে তার পচন, ক্ষয় ও ভ্রান্তি-প্রসূত সংক্রামক অসুখ সঠিক যাথার্থ্যে উপস্থিত করা; প্রশ্ন জাগিয়ে তোলা—বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার চিরস্থায়িত্ব সম্পর্কে। ব্যক্তি ও বহুমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি কোন্ বিমূঢ় অসহায়তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে তা যথাযথ বর্ণনা করা,—সমাধানের ইংগিত দান লেখকের পক্ষে জরুরী নয়; বরং ওপথে না যাওয়াই ভালো; কেন না, সরল-রৈখিক কেতাব-সমর্থিত সমাধানে শিল্পের দ্বন্দ্ব বক্তিম সজীবতা রক্ষা করা দুরূহ, কেন না—আমি চাই আমার স্পষ্ট অবস্থানটি বুঝে নিতে। আমার দায় ও দায়হীনতা, পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা, ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক সম্বন্ধে এতাবৎ আচরিত চিন্তাপদ্ধতি—মানবিক পদ্ধতিতে পুনর্বিচার—এইসব জরুরী কৃত্যগুলি লেখকের পক্ষে বর্তমানের উপযোগী ভাবনা। ভবিষ্যতের ইংগিত হয়তো বেরিয়ে আসবে এইসব চিন্তা-চেতনার টানা-পোড়েন থেকে—আর তা-ই হবে সজীব ও প্রাণবন্ত শিল্প।

লেখক মাত্রই শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যবাদী। উদ্দেশ্য তার একটা আছেই, কিছু বলার তাড়না, বলতে পারি প্রেরণা, এমনকি। তাড়িত হয়ে লেখেন তিনি, না লিখে তাঁর উপায় নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেন লিখি' প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—'জীবনকে আমি যে ভাবে ও যতভাবে উপলব্ধি করেছি অন্যকে তার লঘু ভগ্নাংশ ভাগ দেওয়ার তাগিদে আমি লিখি। আমি যা জেনেছি, এ জগতে কেউ তা জানে না (জল পড়ে পাতা নড়ে নয়)। কিন্তু সকলের সঙ্গে আমার এক শব্দার্থক ব্যাপক সমভিত্তি আছে। তাকে আশ্রয় কোরে আমার খানিকটা উপলব্ধি অন্যকে দান করি।'—বোঝা যায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অপরের কাছে তুলে ধরবার তাগিদই এক্ষেত্রে তাড়না; অন্যার্থে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

লেখক তাড়িত না হলে লেখেন না। যে বর্তমানের টেনশানে তাঁর অবস্থান তাতে আঘাত খেতে খেতে, ভেসে যেতে যেতে অভিজ্ঞতার বহুতল উঠছে স্পষ্ট হয়ে; সৃষ্টি হচ্ছে বিচিত্র অনুভূতিরও; মনে হচ্ছে—এইমত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি এর আগে আর কোনো মানুষেরই হওয়া সম্ভব নয়; অতএব জানিয়ে যেতে হবে অনভিজ্ঞ মানুষগুলির কাছে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। একটি প্রচ্ছন্ন প্রবল তাড়নাবশে কলম ধরতে বাধ্য হন তিনি—এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষই তাঁর প্রেরণা; শব্দের উৎস: কি দেখেছেন তিনি? এ পর্যন্ত যা অন্য কারো রচনায় প্রত্যক্ষ হতে পারেনি—এই সব ব্যক্তিগত দেখা প্রতীকী সর্বজনিনত্বে স্থাপনের গূঢ়েষা তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা। অতএব ওয়াইল্ডের সুখতত্ত্ব ধোপে টেঁকে না, যাকে অনুদ্দেশ আনন্দ বলার দুর্বার বাসনা, তা-ই উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত; 'শুধু অকারণ পুলকে' বলায় যে নান্দনিক সৃষ্টিতত্ত্বের আভাস মেলে তারও অন্তর্মূলের কারণজাত উদ্দেশ্যে অস্ফুট থাকে না। নেতি, নেতি কখন নিজেই একটি নেতিবাদের জন্ম দেয়, হয়ে ওঠে নিজেই একটি দর্শন। বলার কথাটাই তো 'নেতি'। উদ্দেশ্যহীনতাই একধরনের উদ্দেশ্যে পরিণত। তা বঙ্কিমের তরুণ লেখকদের প্রতি দায়িত্ব জ্ঞাপনের নৈতিক-নির্ভর আহ্বানের সোচ্চার ঘোষণায় হোক, কিংবা রাবীন্দ্রিক আনন্দবাদের ছদ্ম দার্শনিকতা-নির্ভর ভাবেই হোক; ওই উদ্দেশ্যই কোনো ভাবে নিজেকে জানায়।

আমাদের ভ্রান্তি নানাভাবে তর্কে রূপ পায়—'হায়, এ দেখছি, কথাটাই বড়ো হয়ে উঠলো, অর্থাৎ উদ্দেশ্য ছাপিয়ে গেছে শিল্পকে',—'কি হবে এইসব লিখে যাতে মানুষের কথাই নেই।' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই বিপরীত কোটির বক্তব্য কখনো হতাশায় ভেঙে পড়ে, কখনো উপদেশ কিংবা অভিযোগজনিত তিরস্কারে

চমৎকার সমর্থন খোঁজে। লেখকের পক্ষে এই সব অভিযোগ বা তিরস্কারের মুখোমুখি হতেই হবে কোনো না কোনো সময় ; অবশ্য পূর্বাহ্নেই পাঠ নিতে হবে তার কাছে, যে তাকে শেখাতে পারে সময়ের গূঢ় ও প্রকাশ্য অভিসন্ধিগুলির তাৎপর্য আর নিজের পথ নিজেকেই খুঁজে নেবার আত্মিক উৎসাহ। শিল্পীর সবকিছুতেই খুঁতখুঁতে হওয়া উচিত যা আসক্তিরই চরম অভিব্যক্তি। অন্যদিকে সন্ধিৎসু চোখের সামনে বিরাট বিশ্বের আমন্ত্রণ, যা আনে চরম নিরাসক্তি। প্রতিটি তাৎপর্য-গ্রন্থিত ঘটনাকে পাশ কাটানো স্বাভাবিক শিল্পীর কাজ হতে পারে না ; তার মতন জীবনকে জড়িয়ে আর কে থাকতে পারে ? মাখতে হবে ক্লেদ ও শুভ্রতা ; পতন ও পুণ্য উত্থানের বিপরীতধর্মী হয়েও মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলের শোণিত তার সর্বাঙ্গে ; প্রতিটি পদক্ষেপই তার কাঁটার ঘায়ে ক্ষত বানায়, রক্ত ঝরে টকটকে লাল আবার নীলচে দূষিত ; একটি পরিপূর্ণ মানুষের জাগরণ ঘটতে পারে শুধু তারই মধ্যে। দেখাব ঔদায, উদাসীনতা ঘৃণ্য, অন্তত শিল্পের পক্ষে নির্বেদ অস্বস্তিকর। অসংখ্য বন্ধন মাঝে যার অবস্থান সেই মানুষ বন্ধনমুক্তি কামনা করতে পারেন না। ভালোবাসায়, গভীর অপ্রেমে তার ক্ষতক্লিষ্ট আত্মা শোধিত ; জানেন না, কি তাকে দিতে পারে আরোগ্য ; শুধু নিজের অরোগ অক্লিষ্ট জীবনই নয়, চাই শিকড়ে জড়ানো মাটির নিরাময় উর্বরতা। কিভাবে পেতে হয় তা, সন্ধান করাই শিল্পীর দায়। তাব সৃষ্টি এই সন্ধানের এই সংশয়ের এই দ্বন্দ্বের। সমাধান ? নাই বা পেলাম। সমস্যা—যা উপরিতলের আলগা দেখার নয়, গভীর অন্তর্গত রক্তক্ষরণজাত—পাঠকের পক্ষে শুভংকর। শিল্পীকে এই সমস্যার বহুদূর ও বহুতল বিস্তৃতসূত্রগুলির জট খুলতে হবে স্বচ্ছ উপলব্ধির যুক্তিতে ; তুলে ধরতে হবে নিখুঁত নির্মাণে ; আর তা যদি শৈল্পিক অনুষঙ্গে সংহত হয়ে বেজে ওঠে—সমাধানেরও ইংগিত প্রচ্ছন্ন সত্যের দ্যুতিতে জ্বলে উঠবে তাব মধ্যে।

এই দেখাটাই আসল ; শুধু দেখা নয় ; দেখানোও। দেখাতে গেলেই প্রকাশের প্রশ্ন, আর প্রকাশই শিল্প। অতএব সব শিল্পের আত্মপ্রকাশের পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রসঙ্গত দুটো উল্লেখ : দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ। উদ্দেশ্য সোচ্চার। অত্যাচারী বণিকের অত্যাচারের প্রতিবিধান। প্রত্যক্ষতই বঙ্কিমী দর্শন—লিখে যদি উপকার না করা যায়, লিখে কি লাভ ? দীনবন্ধু সমাজের অন্ত্যস্থ চাষীদের দুঃখে অভিভূত, চান প্রতিকার, কলমও ধরেছেন উদ্দেশ্য নিয়ে।

একালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাড়ে সাত সের চাল কিংবা সমুদ্রের স্বাদ গল্পে হয়তো ওরকম উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট কোরে তুলে ধরবার জন্য লেখেননি; কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য পাঠান্তে অস্পষ্ট থাকে না। বলা যায়—এই উদ্দেশ্য সংক্রামিত হতে থাকে গভীরে; সময়ের স্পষ্ট ব্যাধি সম্পর্কে কোরে তোলে সচেতন; একটা অতল অস্বস্তিতে দিনমান কেটে যায়। লেখক এই দু'ভাবেই তাঁর উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করতে পারেন যদি থাকে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির তীব্রতা। নিজে যেমন বেজে উঠবেন সকল রাগিণীতে, বাজিয়ে দেবেন তার তানে সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকেও।

উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা শিল্পের বিরোধী নয় যদি তা উপলব্ধি ও অনুভূতির সুসম সমন্বয়ী প্রকাশ পায়; আর মাত্রই ঘোষণায় তাৎক্ষণিক চরিত্র যদি হয় প্রকট, বক্তব্যের জরুরীত্ব মান্য হলেও উত্তীর্ণ কলা হিসেবে মর্যাদা অকিঞ্চিৎকর। আমাদের এই মূল প্রশ্ন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে; যেন ভুলে না যাই—আমার কিছু বলার আছে বলেই শব্দকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছি; অন্যথায় আত্মপ্রকাশের নানা মাধ্যম আছে; যখন শব্দকেই বেছে নিলাম, তার নানা স্তর উন্মোচন ব্যক্তিসত্তারই বহুস্তর উন্মীলনের প্রয়োজনে। অনুশাসন যেন জয়ী না হয় অনুসন্ধানের উপর। অনুসন্ধান শিল্পের সহায়, অনুশাসন তার হয়ে ওঠার বিরোধী। সপ্রাণ আর আবেগী বক্তমোক্ষণ, যা শিল্পের পক্ষে প্রথম মান্য শর্ত তা সন্ধিৎসু মনের চরিত্র। অনুশাসনে বিদ্রোহ নেই, আছে বশ্যতা। বশ্যতায় রক্তের স্বভাব হিমশান্ত; বিদ্রোহে অতৃপ্তি, অশান্তি, উদ্বেগ, অস্থিরতা, আকৃতি, আনন্দ। শিল্পীকে বিদ্রোহী হতেই হবে। আব বিদ্রোহ আসে পরিবর্তনের দুর্বার পিপাসা থেকে। প্রত্যক্ষপ্রেবণা বা উদ্দেশ্য একটি স্থির বিন্দুর দিকে চালিত করে তাকে, খুঁজে পায় না কেন্দ্রবিন্দু, সন্ধান চলতে থাকে অবিরল, অবিশ্রান্ত। আবেগে কম্পিত হতে হতে এই সন্ধান; পৌঁছে গিয়েও মনে হয়, বহুদূরে; অধিকৃত সাম্রাজ্য মনে হয় অপরিচিত। শিল্পীমাত্রই নিরুদ্দেশের যাত্রী। অবশ্য উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে আজ আর সিন্ধুপারের বিদেশিনী নয়; ক্ষুধায়, পিপাসায়, ঈর্ষায়, উচ্ছ্বাসে, হতাশায়, উদ্দীপনায় উদ্বেলিত সংরক্ত সংশক্ত মানুষ সেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সাহিত্যের বিষয়। সহিতত্ব থেকেই সাহিত্য, অতএব জীবনসম্পর্কিত তাবৎ আচরণ ও চিন্তনই সাহিত্য; উদ্দেশ্য—তাকে সামগ্রিক সফলতায় শব্দবন্ধ করা। পদ্ধতি পৃথক

হতে পারে, উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বহুচারিতাও স্বাভাবিক, কিন্তু উদ্দিষ্ট বা লক্ষ্য যে রচনাকালীন প্রেরণা তা কোনোভাবেই অস্বীকৃত হবার নয়। আবার সাহিত্য একাধারে প্রচারেরও মাধ্যম। কি প্রচার? লেখকের বিশেষ বলার কথাটি অপরকে জানানো। তা সোচ্চার হোক কিংবা মৃদুতম বিনয়বিগলিত হোক, কথাটা আভাসে ইংগিতে পৌঁছে দিতেই হবে। অবশ্য অন্য সবরকমের প্রচারের মাধ্যম থেকে সাহিত্যের তফাৎ গুণগতভাবেই দুস্তর দূরত্বে আসীন। সাহিত্য সংক্রমিত হতে থাকে, তা অনুভূতি অভিজ্ঞতা উপলব্ধির নিঃশব্দ আক্রমণ। এমত প্রচারযন্ত্র গভীর আবেগমথিত, মননপরিশিলীত; তাই অতলান্ত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম যা অন্যান্য মঞ্চ-মথিত প্রচারযন্ত্রের ধারণারও বাইরে। হতে হবে শিল্পের শর্তে আস্থাবান, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়; সন্ধানে সাহস, সঙ্কল্পে অনড়। নিরুদ্দেশ যাত্রীর শব্দবিলাস অধুনাতন বস্তুবিশ্বের পক্ষে অবশ্য পরিহার্য।

হালের সমালোচনার স্বভাব চরিত্র

…"আপনার কবিতা তখন থেকেই আমার ভালো লাগে।……

…কোন সন্দেহ নেই, 'ঘোড়সওয়ার' একটি প্রথম শ্রেণীর কবিতা, বর্তমান যুগের বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ-কথাও বলবো, এই কবিতা যে কোনো ভাষাতেই গৌরবের বিষয় হ'তো।…

১৯৩৮-এ চোরাবালি গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু এসব মন্তব্য করেছিলেন। লেখাটি চিঠির ঢঙে, যেন মুখোমুখি কথা বলছেন পাঠক লেখকের সঙ্গে, অবশ্য পাঠকই তার অনুরণনের কথা জানাচ্ছেন, লেখকের কি উত্তর তা জানা যাচ্ছে না।

নানা প্রশ্ন এবং নিজের ধাঁচে উত্তর বুদ্ধদেব করেছেন চোরাবালির কোনো কোনো কবিতা, কোনো শব্দ প্রসঙ্গে, এমন কি সুধীন্দ্রনাথকৃত ভূমিকা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন,—এর প্রাসঙ্গিকতা আদৌ আছে কি না, কেন না বিষ্ণু দে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে নতুন কোরে পরিচিত হবার নয়।

'১৯৩৮-এ আপনার কোনো পরিচয়পত্রের দরকার নেই—আর যে কোনো অবস্থাতেই একটি কাব্যগ্রন্থ নিজেই শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে—'

কয়েকটি এলোমেলো উদ্ধৃতি একটি প্রসঙ্গের প্রতি ইংগিত করে, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সমকালের কবিদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ আলোচনা করেছেন, তাতে প্রশংসার ভাগ যদি ষোলো আনা নাও হয়, বারোআনা তো বটেই। বিষ্ণু দে-কে তিনি একজন মৌলিক কবি বলেই স্বীকার করেছিলেন, তা জানা যায়। অথচ ১৯৬৬-র এপ্রিলে সব অর্থে শারীরিকভাবে জীবিত বুদ্ধদেব তাঁর প্রবন্ধ সংকলনে বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গে কোনো প্রবন্ধ স্থান দিলেন না। সমকালীন কবি জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী বিষয়ে আলোচনা স্থান পেলো, কেনো বিষ্ণু দে নয়—তা দুর্বোধ্য ঠেকে, যেহেতু বিষ্ণু দে সম্পর্কে তাঁর মতামত কি তা আমরা তাঁরই লেখা থেকে আগে ভাগেই জেনে গেছি।

এটা, বিসদৃশ লাগে, এবং সচেতন ভাবেই যে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ভেবে নিতে পারি। এর পেছনে চোরাবালি সম্পর্কিত রচনাটির দুর্বলতা না বিষ্ণু দে সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে ইতিমধ্যে—কোনটি সক্রিয় নির্ণয় করা কঠিন।

সমালোচনার ক্ষেত্রে এই মত বদলানোর প্রবণতা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়; কোনো লেখা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভালোলাগার পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে, হয়তো ভোক্তার পরিণত মন নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে; তার রুচিবদল ঘটে গেছে বয়সের কারণে। জীবনযাপন পদ্ধতির বদলও এই রকম কারণ ঘটিয়েছে। এছাড়া আমাদের দেশে ব্যক্তিগত সম্পর্ক একটা জরুরী প্রশ্ন। এর উপরে সমালোচনার পক্ষ বিপক্ষ নির্ভর করে। এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় রয়েছে অনেকেরই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শক্তিমান পূর্বসূরির সমালোচনা করেছিলেন অপরিণত বয়সে। পরে অল্প বয়সের ঔদ্ধত্য ও যুক্তিহীনতাকে সংশোধন কোরে নিয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর—কোনো পূর্বসূরির প্রতি নয়, নিজেরই সমকালীন কবি সম্পর্কে পরবর্তীকালে অনীহার কারণ ধরে নিতে পারি কিছুটা রাজনৈতিক মতাদর্শগত, কিছুটা বা ব্যক্তিগত। বিষ্ণু দে-র রাজনীতিক মতাদর্শ সকলেরই জানা, তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী, আর বুদ্ধদেব সাহিত্যের বিশুদ্ধতায় আস্থাশীল। ক্রমাগত তাঁর লেখা শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলো। তিনি বিশুদ্ধতারক্ষার জন্যে নিজের রচনাকে ক্রমাগত গুটিয়ে আনছিলেন। আমাদের চারপাশের দুঃখদারিদ্র্য সমস্যাপীড়িত মানুষ থেকে, তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সংকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমাগত মহাভারত, পুরাণাদি আকড়ে ধরতে হচ্ছিল এই কারণে। আর সমস্যা? প্রেম, বা নরনারীর যৌনসম্পর্ক। চারপাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রমাগত অতীতের ধূসরতায় পলায়ন করছিলেন তিনি, যেখানে তাঁরই প্রিয় কবি প্রকৃতির সুন্দর, সংকটহীন শান্তি থেকে ক্রমাগতই নাগরিক সংকট সমস্যার হাজার কষ্টের জীবনে ফিরে এসেছেন, বুঝতে চেষ্টা করেছেন, সমকালীন ইতিহাস ও সমাজকে নিজের মতন কোরে। বুদ্ধদেব কল্পস্বর্গের বাসিন্দা হয়েছেন পরিণত বয়সে, আর জীবনানন্দ রূপসী বাংলা থেকে বেলা অবেলা কালবেলায় হয়েছেন উত্তীর্ণ। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সংগ্রহে (ভারবি সংস্করণ ১৯৬৬) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল সম্পর্কিত আলোচনা গ্রহণ করা হলো, আর পরিত্যক্ত হলেন উচ্ছ্বসিতভাবে

প্রশংসাধন্য সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিষ্ণু দে-র প্রসঙ্গ তো এলোই না। আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তীকে গ্রহণ করা হলো। খুব খোলা মন নিয়ে এর কারণ খুঁজতে বসলেও সংকলকের গোপন প্রতিজ্ঞা অস্পষ্ট আর থাকে না। সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের যে শাখাটিতে তিনি ইতিমধ্যেই আশ্রয় নিয়েছেন, তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দেখালেন সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী সম্পর্কিত আলোচনা সংকলনভুক্ত কোরে, আর যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সেই মার্কসীয় বিশ্বাসে আস্থাশীল কবিদের একেবারেই বর্জন করলেন তিনি।

সমালোচনার ক্ষেত্রে, সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে, অতএব কোন্ নন্দন তত্ত্বে বিশ্বাসী তা বিচার্য নয়, লেখার উৎকর্ষই বিচার করতে হবে—এই খোলামনের সাহিত্য-সমালোচকই আমাদের নমস্য। অতএব, নিরাসক্ত নয়, দূরত্বে বসে ভোগ করা, বিচার করা, গ্রহণ বর্জন করা, এটাই আলোচনার বৈজ্ঞানিক রীতি হওয়া উচিত। অথচ এতক্ষণ আমরা তার ব্যতিক্রমই নিয়ম হিসেবে দেখতে পেলাম।

একথা কখনোই বলবো না, সমালোচনার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা একমাত্র শর্ত। যেহেতু সাহিত্য ব্যক্তিমনের সৃষ্টি, অতএব ব্যক্তির অভিরুচি বর্জন এক্ষেত্রে অসম্ভব। কিন্তু অভিরুচি যদি বাইরের অভিসন্ধি দ্বারা চালিত হয়, তবে সমালোচক হিসাবে নিজেকে কেউ সৎ বলে দাবি করতে পারেন না। এবং এমন অনেক বিষয় অর্থাৎ রচনা আছে যা বিতর্কিত, এরকম বিতর্কে অংশ না নিয়ে এড়িয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কিছুই নয়—বলে তাচ্ছিল্য করলে বক্তার অভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্রই ধরা পড়ে। আমার ভালো না লাগলেও উত্তীর্ণ লেখার গুণাগুণ উপেক্ষা করা চলবে না। আমি চূড়ান্ত রায় দানের কে ?

সম্প্রতি, একজন পাঁচের দশকের অগ্রণী কবির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম, তিনি তাঁর সময়ের উচ্চকণ্ঠের ঢক্কা নিনাদে ব্যস্ত একজন কবি, যাকে তিনি কবি হিসাবে স্বীকার পর্যন্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তাকে প্রতিভা-পৃষ্ট বলে স্বীকার কোরে নিয়েছেন। আমার সঙ্গে আলোচনাকারী কবির, যখন তিনি ওই ঢক্কা-নিনাদী কবি সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশ করতেন, তাঁর বয়স তখনই প্রাজ্ঞতায় পৌঁছেছিল। তিনি সেই বয়সেই যথেষ্ট পণ্ডিত বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, অতএব সেই সময়ের তাঁর মতামত দ্বারা আমাদের মতন তরুণতম কবি যশোপ্রার্থী প্রভাবিত হয়েছিলাম স্বাভাবিক কারণে। অথচ ব্যক্তিগত ভাবে

আমি ওই উচ্চকণ্ঠের কবির লেখা সম্পর্কে যে মতামত নিজের মধ্যে তৈরী করেছিলাম, পরবর্তীকালে তা বদলের কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। আমার কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতাও প্রায় দুইদশকের উপর। দেশী বিদেশী কবিতার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়ও আছে। আমার সিদ্ধান্ত যে বদলালো না, আর অগ্রজ বিরুদ্ধস্বভাবের কবির এতবড়ো রুচিবদল ঘটলো, এই বিপরীত ক্রিয়ার কারণ আমার কাছে হেঁয়ালী হয়ে আছে এখনো।

সমালোচনা, অন্তত আমাদের দেশে, অনেকটাই ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত। এ যেমন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানই সত্য। সম্পর্ক, তা ব্যক্তিগত কারণে, অথবা রাজনীতিক মতাদর্শের কারণে তিক্ত হলে, লেখকের তাবৎ লেখা—যা নিয়ে সমালোচক একদা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, তাকে লিখিত এবং মৌখিকভাবে একেবারেই নস্যাৎ করবার জন্য তৎপরতা বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে চক্ষুলজ্জাও লজ্জা পায়, এমনি সাড়ম্বর তার ঘোষণা।

এই জন্যেই, কোনো কোনো বয়স্ক বুদ্ধিমান হিতৈষী পরামর্শ দিয়েছিলেন, পারত পক্ষে কারো লেখার নিন্দে করবে না। ওতে শত্রুই বাড়ে। অযথা শত্রু বাড়িয়ে লাভ নেই। এই যদি দায়িত্ববান কবির বা পাঠকের বা পেশাদারী সমালোচকের সিদ্ধান্ত হয়, তবে আলোচনা ব্যাপারটাই একদিন উঠে যাবে, কেউ কোনো দয়িত্বশীল মন্তব্য করবেন না, ফলত পাঠক জানতে পারবেন না তারতম্যের পার্থক্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর শঙ্কর সমান সংখ্যক পৃষ্ঠা জুড়ে বসবেন সাহিত্যের ইতিহাসে, আর গণতন্ত্রের সার্বিক প্রসারে জনমত যাচাই করলে মানিক, বিভূতি, তারাশঙ্করকে ভোটে অনেক ব্যবধানে পরাজিত হতে হবে, আর সতীনাথ ভাদুড়ীর জামানতই বাজেয়াপ্ত হবে, এটা নিশ্চিত। কি চমৎকার একটি দুর্দিনের মধ্যে একঘরে হয়ে দিনাতিপাত করবেন, রক্ত, পুঁজ ক্লেদে প্রসবাতুর কবি, গদ্যশিল্পী। ভাগ্যের হাতে ধরা দিয়ে পরাজিতের নৈরাশ্য সম্বল কোরে একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে তাঁদের। অন্তত, এইসব দুঃস্থসম্রাটদের সাম্রাজ্য আর পাতা হবে না ; সমস্ত জমি গ্রাস কোরে রাজত্ব করবে জায়গীরদার, নিমাই-শঙ্কর-নীহার গুপ্তের বংশধরগণ।

পাঠকের রুচির নির্বাচনের উপরে সব দায় ছেড়ে দেওয়া সুস্থতার লক্ষণ নয় সেই দেশে, যেখানে আশি শতাংশই নিরক্ষর, আর বাকি কুড়ি ভাগের মধ্যে বই পড়ে কয়জন, গুণে বলা যায়। যে কোনো ভালো লেখকের বইও এদেশে

এক সংস্করণ বাইশর্শর বেশী ছাপতে প্রকাশক আতঙ্কিত'। প্রবন্ধ বা কবিতার বই এগারোশ'র সংস্করণ হলে কতো বছরে নিঃশেষিত হবে বলা কঠিন। এই রকম অবস্থা যেখানে, পাঠকের রুচি গঠনের দায়িত্ব সেখানে লেখকের, সৎ সমালোচকদের নিতে হবে, স্বশিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক পাঠকের প্রসঙ্গ আলাদা।

'রুচি গঠনের দায় সমালোচকের স্বেচ্ছাকৃত দায়ভার। জগতে শ্রেষ্ঠ ব'লে যা কিছু জ্ঞাত হয়েছে বা ভাবা হয়েছে তা জানবার এবং প্রচার করবার জন্য নিষ্কাম প্রয়াসই সমালোচনা। আর্ণল্ড অন্যত্র বলেছেন…জগতে শ্রেষ্ঠ যা কিছু জানা হয়েছে বা অনুধ্যাত হয়েছে তা-ই জানা এর কাজ, আরও কাজ এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রচার কোরে সত্য ও সজীব চিন্তাধারার সৃষ্টি করা।

Its business is simply to know the best that is known and thougth in the world, and by in its turn making this known, to create a current of true and fresh Ideas

যেমন এলিয়টের উক্তিতে (Criticism must always profess an end in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of Taste) তেমনি আর্ণল্ডের উক্তিতে প্রধান বক্তব্য হলো জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ চিন্তা সে বিষয়ে, সে জ্ঞান অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে, এবং এতদ্বারা নতুন চিন্তাধারার প্রবাহন করতে হবে। রিচার্ডস বলেছেন : Criticism, as I understand is the endeavour to discrimiate between experiencess and to evaluate them.

(সমালোচনা বলতে আমি বুঝি এক অভিজ্ঞতায় ও অন্য অভিজ্ঞতায় তারতম্য বিচার ও তাদের মূল্যায়ন)—রিচার্ডস-এর ধারণায়ও সমালোচনা কর্মে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, সদসৎ ও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, নতুবা যে কোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপর অভিজ্ঞতায় প্রভেদ বিচার করা যাবে কেমন কোরে ? তাদের মূল্যায়ন করবো কী কোরে।

প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান সমালোচক হেন্‌রি লুই মেন্‌কেন বলছেন খাঁটি শিল্প সমালোচকের কাজ এই : শিল্পবস্তু সম্বন্ধে দর্শকের চিত্তে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করা। বিনা শিক্ষায় দর্শক অসাড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। শিল্পবস্তু তিনি দেখেন বটে কিন্তু তাঁর চিত্তে কোনো বোধগম্য ছাপ পড়ে না। সমালোচনার কোনো প্রয়োজনই হত না যদি স্বতঃই পাঠক শিল্পের প্রতি সংবেদনশীল হতেন।

এখানেও সংস্কৃতি বিস্তারের কথা আছে কিন্তু রুচি বিস্তার তিনি কিভাবে করবেন যদি সংস্কৃতি কোনটি সে বিষয়ে তাঁর নিজেরই জ্ঞান না থাকে ?

বহু সাহিত্যিকের চিন্তাগুরু এজরা পাউণ্ড বলেছেন :

বাছাইয়ের কাজ। যে কাজ বাস্তবিক করা হয়েছে তার বিন্যাসও নিড়নো। জ্ঞানের বিন্যাস, যাতে এর পরের জ্ঞানার্থী (অথবা পরবর্তী পুরুষ পর্যায়ের জ্ঞানার্থী) চট ক'রেই প্রাণবান অংশটি খুঁজে পায়, অপ্রচলিত সমস্যা নিয়ে তার সময় নষ্ট না হয়।

উপরের অংশগুলি পাঠান্তে এটা পরিষ্কার, সমালোচনার কাজ তর, তম'র পার্থক্য নিরূপণ, ভালোটা তাকে কোনো নাড়া দিয়েছে, তা যথেষ্ট যুক্তির সঙ্গে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা।

এখানে ব্যক্তিগত পরিচয় যা সমালোচনাকে ভয়ানক ভাবে প্রভাবিত করছে আমাদের সাহিত্যে, তারই প্রতিপত্তি। আমাদের দেশের লেখকরাই সমালোচক। মাত্রই সমালোচনা কোরে থাকেন এরকম কয়েকজন পণ্ডিত রসিকের নাম উনিশ শতকের সাহিত্য ঘেঁটে পাওয়া যাচ্ছে, বিশ শতকে দূরবিন দিয়ে এঁদের অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের সমালোচককে বর্তমান লেখকের মতনই হয় কবিতা বা উপন্যাস বা গল্পের লেখক, তাকে সব সময়ই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, এমন কিছু বলে না ফেলেন বা লিখে না ফেলেন, পাছে কেউ আঘাত পান, ক্রুদ্ধ হন। কেন ? না, এর প্রতিক্রিয়ায় সমালোচিত কবি লেখক তাকে যে নস্যাৎ কোরে দেবেন না এ ভাবাও অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমের প্রতি সে সময়ের ক্ষুদে ক্ষমতাহীন লেখকদের আক্রমণের কথা উল্লেখ কোরে বলেছেন যে এই সব আঘাত বঙ্কিমের বুকে নিশ্চয়ই বাজতো, 'কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতন স্বাভাবিক প্রতিভার অধিকারী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বই যদি ক্ষুদে লেখকের আঘাতে ব্যথা পান, তবে অন্যান্য লেখকদের পক্ষে ঝুঁকি নেওয়া তো অসম্ভবই। যদি সমালোচক কবি বা লেখক না হন, শুধুই সমালোচক, তবে ব্যক্তিগত আক্রমণের আঘাত সহ্য করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেননা, নিজের পঙ্গু বা ভাল ছেলেটাকে নিয়ে কেউতো আর মস্করা করছে না, সে যে নিঃসন্তান। এরকম সমালোচক আমাদের সাহিত্যে প্রায় নেই-ই বলা যায়। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, অমলেন্দু বসু, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, মাত্রই এই দু'চারজন উদাহরণ।

আর বুদ্ধদেবীয় সাহিত্যবিচার এমন স্থূলতায় শেষ বয়সে পৌঁছেছিল, তাঁর অনুশীলন ও মনীষার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাশীল বর্তমান লেখকেরও ইচ্ছে কোরে চোখ বুজে-থাকা-চোখে না পড়ে পারেনি। আধুনিক বাংলা কবিতার শেষ সংস্করণে আপন জামাতার গুটি কয়েক পদ্য সংযোজন করলেন আর সন্তোষকুমার ঘোষ, যিনি একটিও কবিতা লেখেননি, অন্তত ছাপা হতে দেখিনি, অনেক শক্তিমান কবির লেখাকে অশ্রদ্ধা কোরে নেহাৎ ব্যক্তিগত প্রীতি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে, তাঁরই গদ্যপদ্য লেখাকে নির্বাচন করলেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হবে, তাই বলে সাহিত্য সম্পর্কে নিশ্চিত বোধে পৌঁছেও এই ধরণের কাজ কখনও সমর্থনযোগ্য নয়। একথা ঠিক, একজন লেখকের নিজের অভিরুচি, মানসিক ধাঁচ অনুযায়ী পছন্দ অপছন্দ থাকবেই। তিনি তা-ই নিয়ে সোচ্চার হতে পারেন, এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত বিচারে যদি মনে হয়, কোনো লেখক বিশেষ আদৌ লেখকই নয়, তাহলে তিনি এক্ষেত্রে জনমতের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই যাবেন। বিরূপ কথা লিখবেন এবং দরকার হলে নস্যাৎ কোরে দেবেন। এসব ক্ষেত্রে জরুরী ধর্ম হবে, অপক্ষপাত, যতোটা সম্ভব অপক্ষপাত। শুধু সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই হবে এই বিচার, অন্য কোনো সম্পর্কই কাজে আসবে না।

অভিসন্ধিপ্রসূত নির্বোধ উক্তি ব্যক্তিগত উষ্মার ফলশ্রুতি।

আমাদের বর্তমান সমালোচনার এই হাল চলছে অনেকদিন ধরে। আজ খবরের কাগজের তাবেদারিতে থাকা, শিকল গলায় পরা লেখক ক্ষমতা কত-টুকু বিচার হবার আগেই মহৎ বলে পাঞ্জার ছাপ পিঠে লাগিয়ে ঘোরেন। যে কাগজের আয়ু এক বেলার এবং নির্দিষ্ট বণিকগোষ্টির ইচ্ছেমতো যা চলতে থাকে, সেখানে ভালো লেখার কদর কে করবে। তাই এলিয়টের এই সতর্ক-বাণী ও কষাঘাত

any book, any essay, any note in Notes and queries which Produces a fact even of the order about a work of art is a better piece of work than nine Tenths of the most pretentious critical journalism in journal or in books.

(এই আলোচনাটিতে ডঃ অমলেন্দু বসুর 'সমালোচক কে ?' প্রবন্ধের বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে।)